বাচ্য ও উক্তি পরিবর্তন

ইউনিট ১৪

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাচ্য কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- বাচ্য কত প্রকার ও কি কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাচ্য পরিবর্তনের নিয়ম বলতে পারবেন।

বাচ্য

'বাচ্য' শব্দের অর্থ বক্তব্য। বক্তব্য বিষয়টিতে যখন কর্তা প্রাধান্য লাভ করে, তখন বাক্যটি কর্তৃবাচ্যের যখন কর্মপ্রাধান্য লাভ করে, তখন কর্মবাচ্যের এবং যখন ক্রিয়াপদ প্রাধান্য লাভ করে, তখন ভাববাচ্যের অন্তর্গত বলে ধরা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন–

১. **সেলিনা** স্কুলে যাচ্ছে।
২. পুলিশের গুলিতে **ডাকাত** আহত হয়েছে।
৩. আবুলের বাড়ি **যাওয়া** হলো না।

উপরোক্ত প্রথম বাক্যে কর্তার দ্বিতীয় বাক্যে কর্মের এবং তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য রয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ভঙ্গিই বাচ্য।

বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় বাচ্য।

বাংলাভাষায় বাচ্য চার প্রকার

ক. কর্তৃবাচ্য খ. কর্মবাচ্য, গ. ভাববাচ্য, ঘ. কর্ম-কর্তৃবাচ্য

কর্তৃবাচ্য

যে বাক্যে কর্তার প্রাধান্য থাকে এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয় তাকে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন- অভি বই পড়ছে।

১. কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদ সবসময় কর্তার অনুসারী হয়। অর্থাৎ কর্তার যে পুরুষ ক্রিয়াও সেই পুরুষের হয়ে থাকে। যেমন– শিলা কাজ করছে, সোহাগ খেলা করছে।
২. কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি এবং কর্মে দ্বিতীয়, ষষ্ঠী বা শূন্য বিভক্তি হয়। যেমন–
   ক) তাকে খেতে বলেছি।
   খ) শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান।
   গ) রোগী পথ্য সেবন করে।
   ঘ) চোর আমগুলো চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।
   ঙ) কাঠুরে বনে কাঠ সংগ্রহ করছে।

কর্মবাচ্য

যে বাক্যে কর্মেরই প্রাধান্য এবং ক্রিয়াটি কর্মের অনুগামী অর্থাৎ কর্ম যে পুরুষের, ক্রিয়াটিও যদি সেই পুরুষের হয়, তবে তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন– পাহারাদার কর্তৃক চোর ধরা পড়েছে।

১. কর্মবাচ্যে কর্মে প্রথমা, কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি ও দ্বারা দিয়া (দিয়ে) কর্তৃক অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যেমন–
   ক) আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য দেশ বিজিত হয়।
   খ) চোরটা ধরা পড়েছে।
   গ) আমাকে আবৃত্তি করতে হবে।
   ঘ) আজ গান শোনা হবে।

২. কখনো কখনো কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হতে পারে। যেমন–
   ক) আসামীকে জরিমানা করা হয়েছে।
   খ) আলমকে ডাক।
   গ) আমাকে আবৃত্তি করতে হবে।

ভাববাচ্য

যে বাক্যে কর্ম থাকে না, ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে।

১. ভাববাচ্যের ক্রিয়া সর্বদাই নাম পুরুষের হয়। ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া বিভক্তি হয়ে থাকে। যেমন-
   ক) আমার (কর্তায় ষষ্ঠী) বাড়ি যাওয়া হলো না(নামপুরুষের ক্রিয়া)।
   খ) আমাকে (কর্তায় দ্বিতীয়া) ঢাকা যেতে হবে। (নাম পুরুষের ক্রিয়া)।
   গ) তোমার দ্বারা(কর্তায় তৃতীয়া) এ কাজ হবে না। (নাম পুরুষের ক্রিয়া)।

২. কখনো কখনো ভাববাচ্যে কর্তা উহ্য থাকে, কর্মের দ্বারাই ভাববাচ্য গঠিত হয়। যেমন–
   ক) এ পথে চলা দুষ্কর।
   খ) এবার ওটা যাক।
   গ) কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

৩. মূলক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগী ক্রিয়ার সংযোগ ও বিভিন্ন অর্থে বাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন–
   ক) এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা অনুচিত।
   খ) এ পথ আমার চেনা নেই।
   গ) মরণরে তুহু মম শ্যাম সমান।
   ঘ) জিজ্ঞাসিলে কহিবারে পারি, জানো তো স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।

কর্ম-কর্তৃবাচ্য

যে বাক্যে কর্মকারক কর্তার মতো প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্ম কর্তার মনোযোগ ব্যতীত সম্পাদিত হয়, তাকে কর্ম-কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন–
   ক) আম পেকেছে খুব।
   খ) তাঁর বইটি বাজারে বেশ কাটছে।
   গ) অব্যয় বাঁশি বাজায়।
   ঘ) কাপড় ছেঁড়ে।
   ঙ) তোমাকে রোগা দেখায়।

সাধারণত প্রাকৃতিক ঘটনামূলক ক্রিয়ার এই বাচ্যের প্রয়োগ দেখা যায়।

বাচ্য পরিবর্তন

কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য ঃ

নিয়ম ঃ কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে–

১. কর্তায় তৃতীয়া

২. কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্মের অনুগামী হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে তার কর্মবাচ্য হয় না।

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
ক) বিদ্বানকে সকলেই আদর করে।	ক)বিদ্বান সকলের দ্বারা আদৃত হন।
খ) ঈশ্বর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।	খ) বিশ্বজগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে।
গ) আনন্দময়ী পুস্তক পাঠ করছে।	গ) আনন্দমীয় কর্তৃক পুস্তক পঠিত হচ্ছে।

লক্ষণীয় ঃ কর্তৃবাচ্য ব্যবহৃত তৎসম ক্রিয়াটি কর্মবাচ্য যৌগিক ক্রিয়াজাত ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্য ঃ

নিয়ম ঃ কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে কর্তার ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া নাম পুরুষের হয়। যেমন–

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
ক) আমি কোথাও যাবো না।	ক) আমার যাওয়া হবে না কোথাও।
খ) তুমিই রাজশাহী যাবে।	খ) তোমাকেই রাজশাহীতে যেতে হবে।
গ) তোমরা কখন এলে।	গ) তোমাদের কখন আসা হল।

কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য ঃ

কর্মবাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে–

১. কর্তার প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া বা মূল বিভক্তি হয়ে থাকে

ক. কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয় বা শূন্য বিভক্তি হয়ে থাকে।

খ) ক্রিয়া কর্তা অনুযায়ী হয়। যেমন–

কর্মবাচ্য	কর্তবাচ্য
ক) দস্যুদল কর্তৃক গৃহটি লুণ্ঠিত হয়েছে।	ক) দুস্য দল গৃহটি লুণ্ঠন করেছে।
খ) হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ বিধ্বস্ত হয়।	খ) হালাকু খা বাগদাদ ধ্বংস করে।

ভাববাচ্য	কর্তৃবাচ্য

ক) তোমাকে পাশ করতে হবে।	ক) তুমি পাশ করবে।
খ) এবার একটি গান করা হোক।	খ) এবার (তুমি) একটি গান কর।
গ) তার যেন আসা হয়।	গ) সে যেন আসে।
ঘ) চা পান করা হোক।	ঘ) (তুমি) চা পান কর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ভঙ্গিকে বলা হয়–

ক) কথা ☐ খ) বক্তব্য ☐

গ) বাচ্য ☐ ঘ) ব্যঞ্জনা ☐

২. যে বাক্যে কর্মের প্রাধান্য থাকে, এবং ক্রিয়াটি কর্মের অনুগামী হয় তাকে বলা হয়

ক) কর্তৃবাচ্য ☐ খ) কর্মবাচ্য ☐

গ) ভাববাচ্য ☐ ঘ) কর্ম-কর্তবাচ্য ☐

৩. বাচ্য কত প্রকার-

ক) পাঁচ প্রকার ☐ খ) তিন প্রকার ☐

গ) চার প্রকার ☐ ঘ) দুই প্রকার ☐

৪. বাচ্যান্তর করুন

ক) কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে

–আলেকজান্ডার পারস্য দেশ জয় করেন।

–মহাকবি ফেরদৌসী শাহনামা মহাকাব্য রচনা করেছেন।

–শিকারী বাঘ মেরেছে।

–আমি বইটি পড়েছি।

৫. কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে

–কাফেলা দুস্যদল দ্বারা আক্রান্ত

–স্থপতি ঈসা বুমীর তত্ত্বাবধানে তাজমহল নির্মিত হয়েছে।

–মধুসূদন কর্তৃক মেঘনাদবধকাব্য রচিত হয়েছিল।

–স্বামী কর্তৃক স্ত্রী বিতাড়িত হয়েছে।

৬. কর্তৃবাচ্য থেকে ভাব বাচ্যে এবং ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করুন

–এবার একটি কবিতা আবৃত্তি হোক।

–আমি একাই খাব।

–আজ আর তোমার খাওয়া হবে না।

–ধর্মস্থানে বেয়াদবি করতে নেই।

৭. বাচ্যের ব্যবহারে ভুল থাকলে শুদ্ধ করুন ঃ

–তোমার যাওয়া হউক আমি যাওয়া হবে না।

–ছাত্রগণ তোমাদিগকে কর্তৃক ব্যাকরণের পাঠ শোনা হউক।

–শাসন করা তাই সাজে, সোহাগ করে যে।

–আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজে।

–মাতা কর্তৃক একটি কলম দান করা হইয়াছি।

উত্তর

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. গ ২. খ ৩. গ

পাঠ ২ ঃ উক্তি পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- উক্তির সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ জানতে পারবেন।
- উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তির পার্থক্য কি তা বলতে পারবেন।

কোনো কিছু বলার নাম উক্তি

উক্তি দুই প্রকার ঃ প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি

যে বাক্যে বক্তার নিজের কথাই অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে।

যেমন ঃ

১. বারেক বলল, "আজ সাত দিন যাবৎ আমি টাইফয়েড জ্বরে ভুগছি।"

২. তিনি বলিলেন "আজই আমার কোর্টে যাওয়া দরকার।"

৩. আয়েশা বলল, "এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর"।

৪. কপালকুন্ডলা বলিল, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ, আইস পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

৫. নবীন বলল, "আমি কলেজে যাব"

বক্তার নিজের কথার যথাযথ উল্লেখ না করে যদি অন্য ব্যক্তি নিজের কথায় তা প্রকাশ করে তবে তাকে বলে পরোক্ষ উক্তি।

যে বাক্যে বক্তার উক্তি অন্যের জবানীতে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে।

যেমন ঃ

১. কালাম বলল যে, সে আজই সাভার যাবে।

২. তনু বলল যে, তার অসুখ করেছে।

৩. অব্যয় বলল যে, তার বাবা-মা দুজনেই দেশের বাইরে আছেন।

৪. অভিন্ন বলল যে, সে ক্রিকেট খেলোয়াড় হবে।

৫. শিলা বলল যে, সে রোজা রাখবে।

উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম ঃ

১ প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু (" ") উদ্ধার চিহ্নের অর্ন্তভুক্ত থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধার চিহ্ন লোপ সাধন করতে হয় এবং উদ্ধার চিহ্ন স্থানে 'যে' এই সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহার করতে হয়। বাক্যের সঙ্গতি রক্ষার জন্য বক্তব্যের মধ্যে বক্তার পুরুষের পবিবর্তন করতে হয়। যেমন ঃ

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ আমেনা বলল, "আমার ভাই বাড়ি নেই।"

পরোক্ষ উক্তি ঃ আমেনা বলল যে, তার ভাই বাড়ি ছিলেন না।

২. বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনামের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ আলিম বলল, "আমার বাবা আজই ঢাকা যাচ্ছেন"।

পরোক্ষ উক্তি ঃ আলিম বলল যে, তার বাবা সেদিনই ঢাকা যাচ্ছেন।

৩. প্রত্যক্ষ উক্তি কালবাচক পদকে পরোক্ষ উক্তিতে অর্থ অনুসারী করতে হয়। যেমন–

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ হেলাল স্যার বললেন "কাল তোমাদের ক্লাস ছুটি থাকবে।"

পরোক্ষ উক্তি ঃ হেলাল স্যার বললেন, পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।"

৪. প্রত্যক্ষ উক্তির বাক্যের সর্বনাম এবং কালসূচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে থাকে।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আগামীকাল	পরদিন
ইহা	তাহা	গতকাল	আগেরদিন
এ	সে	গতকল্য	পূর্বদিন
এখানে	সেখানে	এখন	তখন
ওখানে	ঐখানে	আজ	সেদিন

৫. অর্থ-সংগতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন হতে পারে। যেমন–

প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ আজাদ বলল, "আমি এক্ষুণি আসছি।"

পরোক্ষ উক্তি ঃ আজাদ বলল যে, সে তক্ষুণি যাচ্ছে।

৬. আশ্রিত খন্ড বাক্যের ক্রিয়ার কাল পরোক্ষ উক্তিতে সব সময় মূল বাক্যাংশের ক্রিয়ার কালের ওপর নির্ভর করে না। যেমন–

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** ফারুক লিখেছিল, "বগুড়ায় খুব শীত পড়েছে"।
পরোক্ষ উক্তি ঃ ফারুক লিখেছিল যে, বগুড়ায় খুব শীত পড়েছিল।

খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** জামাল বলেছিল, "আমি বাজারে যাচ্ছি।"
পরোক্ষ উক্তি ঃ জামাল বলেছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছে।

গ) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** মইন বলল, "আমি সিলেট যাব।"

পরোক্ষ উক্তি ঃ মইন বলল যে, সে সিলেট যাবে।

৭. প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোনো চিরন্তন সত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন–

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

পরোক্ষ উক্তি ঃ শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** বৈজ্ঞানিক বললেন, "চম্বুক লোহাকে আকর্ষণ করে।"

পরোক্ষ উক্তি ঃ বৈজ্ঞানিক বললেন যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

৮. প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাসূচক ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তি পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হলে প্রধান খন্ডবাক্যের ক্রিয়াকে ভাব অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–

প্রশ্নবোধক বাক্য

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** শিক্ষক বলেন, "তোমরা ছুটি চাও?"

পরোক্ষ উক্তি ঃ আমাদের ছুটি চাই কিনা শিক্ষক তা জিজ্ঞেস করলেন।

খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** মা বললেন, "কবে পর্যন্ত তোমাদের ফল বের হবে?"

পরোক্ষ উক্তি ঃ আমাদের ফল কবে পর্যন্ত বের হবে মা তা জানতে চাইলেন।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** জলি বলল, "তোমরা আগামীকাল এসো।"

পরোক্ষ উক্তি ঃ জলি তাদের পরদিন আসতে (বা যেতে) বলল।

খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** তিনি বললেন, "দয়া করে বাইরে আসুন।"

পরোক্ষ উক্তি ঃ তিনি (আমাকে) বাইরে যেতে অনুরোধ করলেন।

আবেগসূচক বাক্য

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** ফরিদা বলল, "বা"! ফুলটি খুব সুন্দর।"

পরোক্ষ উক্তি ঃ ফরিদা আনন্দের সঙ্গে বলল যে, ফুলটি খুব সুন্দর।

খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি ঃ** বস্তিবাসী মেয়েটি দুঃখের সঙ্গে বলল, "শীতে আমরা কতই না কষ্ট পাচ্ছি।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. উক্তি বলতে কি বোঝায়? উক্তি কয় প্রকার ও কি কি?

২. উক্তি পরিবর্তনের নিয়মগুলো সংক্ষেপে লিখুন।

৩. যে বাক্যে বক্তার কথা অবিকল উদ্ধৃত হয় তাকে বলে

ক) উক্তি ☐ খ) বাচ্য ☐

গ) প্রত্যক্ষ উক্তি ☐ ঘ) পরোক্ষ উক্তি ☐

৪. যে বাক্যে বক্তার উক্তি অন্যের জবানীতে রূপান্তরিতভাবে প্রকাশিত হয় তাকে বলে

ক) বাচ্য ☐ খ) পরোক্ষ উক্তি ☐

গ) উক্তি ☐ ঘ) প্রত্যক্ষ উক্তি ☐

৫. প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু যে চিহ্নে অর্ন্তভুক্ত থাকে তাকে বলে☐

ক) কমা চিহ্ন ☐ খ) দাঁড়ি চিহ্ন ☐

গ) উদ্ধার চিহ্ন ☐ ঘ) যতি চিহ্ন ☐

৬. উদ্ধার চিহ্ন স্থানে কোন্ সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়

ক) সে ☐ খ) কে ☐

গ) যা ☐ ঘ) যে ☐

৭. নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ উক্তিগুলো পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত করুন

ক) তনু বলল, "সেকি? আপনি এখনই যাবেন।"

খ) সেনাপতি বললেন, "মহারাজ আমরা থাকতে আপনি কেন যুদ্ধে যাবেন? আজই শত্রুদের বন্দী করে আনব। অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের যেতে অনুমতি দিন।"

গ) বাবা বললেন, "পৃথিবী গোলাকার! পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যই ফল মাটিতে পড়ে।"

ঘ) মা বললেন, "অমিত দেরী না করে চলে এস, পড়তে বস। মন দিয়ে পড়ে। আগামীকাল তোমার ইতিহাস পরীক্ষা, মনে নেই?"

ঙ) বড় ভাই বললেন, "আমি একজন আদর্শ মানুষ হতে চাই।"

ছ) সাবেরা বলল, "এবার আমার ঈদের পোশাকটি সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে।"

উত্তর

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

৩. গ ৪. খ ৫. গ ৬. ঘ

বিরাহ চিহ্ন

ইউনিট ১৫

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- বিরাম চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- বাংলা সাহিত্যে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ও এর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- বিরাম চিহ্ন সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বিরাম চিহ্ন বলতে কি বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিরাম চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কথা বলে। এই যে কথা, আমরা মুখে বলে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি তা কিন্তু লিখেও অন্যকে জানান যায়। দূরের আত্মীয় বা বন্ধুকে আমরা লিখে আমাদের মনের ভাব সম্পূর্ণ জানাতে পারি। আবার যে ভাবনা সরাসরি কাউকে জানাচ্ছি না – অনাগত মানুষ ও কালের জন্যও লিখে যেতে পারি। লিখিত ভাষায়, নিশ্চয় আপনারা লক্ষ্য করেছেন – আমরা চিহ্ন ব্যবহার করি। এ চিহ্নগুলো দুটো কারণে ব্যবহৃত হয় – (এক) বাক্যের অর্থকে সঠিকভাবে অন্যের কাছে পৌঁছানর জন্য, দুই– বাক্যটি উচ্চারণ করে পড়লে বাক যন্ত্রকে বিরাম দানের জন্য। আপনারা খেয়াল করেছেন, আমরা একনাগাড়ে কথা বলে যেতে পারি না। মাঝে মাঝে থেকে আমাদের নি:শ্বাস গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া স্বরসঙ্গতিহীন অবস্থায় একের পর শব্দ উচ্চারণ করে গেলে তার অর্থ বোঝা যায় না। এসব কারণে– কথা অন্যের কাছে বোধগম্য ও আমাদের বাগযন্ত্রকে বিরাম দানের জন্য মাঝে মাঝে কথা বলার মধ্যে বিরতি দেই। এই বিরতিগুলোই কথা লেখার সময় অর্থাৎ ভাষাকে যখন আমরা লিখিত রূপ দেই, তখন নানা রকম চিহ্ন দিয়ে বিরতির ইঙ্গিত দেই। কথা বলার সময় শ্বাস গ্রহণের জন্য আমরা থামি, তাকে বলে শ্বাস পর্ব বা breath pause, আগেই বলেছি অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যও আমরা বিরতি দেই – একে বলে সার্থপর্ব বা Sense Pause।

বিরতিচিহ্নহীন নিচের অংশটি পড়ুন

অর্থ হায় রে অর্থ পাতকী অর্থ তুই জগতের সকল অনর্থের মূল জীবনের ধ্বংস সম্পত্তির বিনাশ পিতা পুত্রের শত্রুতা স্বামী স্ত্রীতে মনোমালিন্য ভ্রাতা ভগ্নীতে কলহ রাজা প্রজায় বৈরীভাব বন্ধু বান্ধবে বিচ্ছেদ বিবাদ বিসংবাদ কলহ বিরহ বিসর্জন বিনাশ এ সকলই তোমার জন্য সকলের অনর্থের মূল ও কারণই তুমি।

এবারে উপরে উদ্ধৃত অংশটি বিরতিচিহ্নসহ নিম্নে উদ্ধৃত হয়েছে। পড়ে দেখুন বিরতি চিহ্নের কারণে কত সহজে অর্থ বোধগম্য হচ্ছে।

অর্থ? হায় রে অর্থ! হায়রে পাতকী অর্থ? তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা পুত্রের শত্রুতা, স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য। ভ্রাতা-ভগ্নীতে কলহ, রাজা-প্রজায় বৈরীভাব, বন্ধু-বন্ধবে বিচ্ছেদ। বিবাদ, বিসংবাদ, কলহ, বিরহ, বিসর্জন, বিনাশ ও সকলই তোমার জন্য। সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি।

বাক্যে বিরামচিহ্ন বসালেই চলবে না। উপযুক্ত স্থানে যদি বিরতি চিহ্নের ব্যবহার না হয় তাহলে অর্থ বিপর্যয় ঘটে যায়। নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন।

যেখানে সেখানে থুথু না ফেলার জন্য একস্থানে নির্দেশ দেওয়া আছে – এখানে থুথু ফেলিবেন না, ফেলিলে দশ টাকা জরিমানা হইবে।

এ বাক্যটিতে সঠিকভাবে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে। বিরাম চিহ্ন সঠিক স্থানে না বসালে অর্থ কি রকম বদলে যায় দেখুন। যদি এরকম লেখা হয়–

এখানে থুথু ফেলিবেন, না ফেলিলে দশ টাকা জরিমানা হইবে।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় বলুন তো! অর্থ একেবারে বদলে যাচ্ছে না?

এজন্য বিরামচিহ্নের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া দরকার। না হলে অর্থ বিপর্যয় ঘটা স্বাভাবিক।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানলাম – বিরাম চিহ্ন কি, এগুলো কেন ব্যবহার হয় ইত্যাদি। ঐ আলোচনাকে সংহত করে বিরাম চিহ্নের সংজ্ঞার্থ আমরা এরকম করে রচনা করতে পারি–

লিখিত বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করার জন্য ছেদ বা বিরাম নির্দেশক যে চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয়, তাকেই বলে বিরাম চিহ্ন।

বাংলা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার

বাংলা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বাহন ছিল কবিতা। এসব কবিতায় দাঁড়ি ছাড়া আর কোন বিরাম চিহ্নের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি না। অবশ্য দাঁড়ি তাঁরা দুই রকমের ব্যবহার করতেন। যেমন– এক দাঁড়ি [।] ও দুই দাঁড়ি [॥]। প্রথম পংক্তির শেষে এক দাঁড়ি[।] ও দ্বিতীয় পংক্তির শেষে দুই দাঁড়ি [॥] তখনকার কবিরা ব্যবহার করতেন। নিচের উদ্ধৃতিটিতে এক দাঁড়ি[।] ও দুই দাঁড়ির [॥] ব্যবহার লক্ষ্য করুন।

যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবানী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ ন যায়॥

আধুনিক কালে বাংলা গদ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাকে প্রাণবন্ত ও প্রাঞ্জল ও বেগবান করে তোলার প্রয়োজনে বিরাম চিহ্নের ব্যবহারের সূত্রপাত হয়। রাজা রামমোহন রায় বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সার্থকভাবে বাংলা গদ্যে বিরামচিহ্নের ব্যবহার করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দকে বিদ্যাসাগরই প্রথম ধরতে পেরেছিলেন এবং গদ্যে ব্যবহার করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বাক্যের মধ্যে শ্বাসপর্ব ও সার্থপর্বকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করেছিলেন। বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের এ অসামান্য অবদান চিরস্মরনীয় হয়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমত কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্দিষ্ট স্থানে লিখুন

১. মানুষ কি ভাবে অন্যের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করে।

উত্তর.....
.....।

২. আমরা লিখি কেন?

উত্তর॥.....
.....।

৩. আমরা থেমে থেমে কথা বলি কেন?

উত্তর॥.....
.....।

৪. শ্বাসপর্ব ও সার্থ পর্ব কি? এগুলোর ইংরেজি প্রতিশব্দ কি?

উত্তর॥.....
.....।

৫. বিরতি চিহ্নহীন একটি বাক্য লিখুন। পরের লাইনে ঐ বাক্যটি লিখে বিরতি চিহ্ন বসান।

উত্তর॥.....
.....।

৬. বিরাম চিহ্নের একটি সংজ্ঞার্থ লিখুন।

উত্তর.....
.....।

৭. বাংলা গদ্যে প্রথম সার্থকভাবে বিরামচিহ্নের ব্যবহার করেন কে?

উত্তর॥.....
.....।

৮. প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কিভাবে লেখা হোত?

উত্তর॥.....
.....।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- বাংলায় ব্যবহৃত বিরতি চিহ্নসমূহ সনাক্ত করতে পারবেন।
- বিরামচিহ্নের ব্যবহার বিধি প্রয়োগ করতে পারবেন।

ভূমিকা

আমরা আগের পাঠের আলোচনায় দেখেছি প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা এক দাঁড়ি [।] ও দুই দাঁড়ির[॥] প্রচলন ছিল। এখনও বাংলায় এক দাঁড়ির [।] প্রচলন আছে, তবে দুই [॥] দাঁড়ির প্রচলন নাই। অন্যান্য যে সব বিরাম চিহ্ন বাংলায় ব্যবহৃত হয় তা সবই এসেছে ইংরেজি থেকে। তবে ইংরেজি থেকে আসলেও বাংলায় এ চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হতে হতে বাংলায় নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। এখন আমরা বিরাম চিহ্নের সঙ্গে পরিচিত হবো।

ক্রমিক নং	বাংলা নাম	ইংরেজি প্রতিশব্দ	আকৃতি	ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য
১.	দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ	Full Stop	।	বাক্য সমাপ্তির পর দীর্ঘতম বিরতি। Point indicating the longest pause after the end of sentence.
২.	কমা বা পাদচ্ছেদ	Comma	,	বাক্যের ভেতরে স্বল্পতম সময়ের বিরতি। Point indicating the shortest pause
৩.	সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ	Semicolon	;	কমার চাইতে দীর্ঘ কিন্তু দাঁড়ির চাইতে কম সময়ের বিরতি Point indicating longer pause than comma but shorter pause than fullstop.
৪.	কোলন	colon	ঃ	সেমিকোলন সমান বিরতি Same pause like semi colon.
৫.	জিজ্ঞাসা চিহ্ন বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন	Note of Interrogation	?	জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হলে এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। Point indicating the question mark
৬.	বিস্ময় চিহ্ন	Exclamation mark	!	বিস্ময়বোধ অথবা গভীর অনুভূতিসূচক চিহ্ন Point indicating great feeling.
৭.	ড্যাস	Dash	-	বাক্যের পরবর্তী অংশে গতিসঞ্চার অথবা উদাহরণ সন্নিবেশের জন্য ব্যবহার করা হয়। Mark for some example or statement.
৮.	কোলন ড্যাস	Colon Dash	ঃ-	নির্দিষ্ট উদাহরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। mark for specific example
৯.	লোপ চিহ্ন	Apostrophe	’	অক্ষর লোপ পেয়েছে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। Mark used to show omitted letters
১০.	বন্ধনী চিহ্ন বা	Brackets	[{()}]	বিশেষ শব্দাবলী ব্রাকেট চিহ্নিত থাকে

	ব্রাকেট			Points indicating word within brackets.
১১.	কোটেশন বা উদ্ধৃতি চিহ্ন	Quotation mark	" "	বক্তার মুখের প্রকৃত কথা উদ্ধৃত হয়েছে বোঝানর জন্য ব্যবহৃত হয় Point indicating quotation mark to show exact word of the speaker.
১২.	হাইফেন বা সংযোগ	Hyphen	-	দুই বা ততোধিক শব্দের সংযোগ বোঝানর জন্য ব্যবহার করা হয়। It marks two or more connecting words.
১৩.	বর্জন চিহ্ন	Asterisk	...	কোন অংশ বর্জিত হলে পরপর তিনটি বিন্দু বসে। Point indicating to some left out portions.

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বিরাম চিহ্নের বাংলা ও ইংরেজি নাম এবং পাশে বিরাম চিহ্নটি বসান

বাংলা নাম ইংরেজি বিরাম চিহ্ন

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- বিরাম চিহ্ন ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবেন।
- সৃজনশীল রচনায় লেখকদের বিরামচিহ্ন ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।

বিরাম চিহ্নের ব্যবহারবিধি

১. দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ[।]

বাক্যের মধ্যে বক্তব্য সমাপ্ত হলে অথবা অর্থ সম্পূর্ণ হলে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ বসে। দাঁড়ি ছেদের পূর্ণতা বোঝায়। একটি বাক্যের দাঁড়ির শেষে বক্তা পুনরায় শ্বাস গ্রহণ করেন ও পরবর্তী বাক্য উচ্চারণ করতে থাকেন।

যেমন– সে পড়ে।

করিম খেলা করে।

মৌলি গান গায়।

২. কমা বা পাদচ্ছেদ

বাক্যের মধ্যে স্বল্পতম সময়ের বিরতি নির্দেশ করে কমা বা পাদচ্ছেদ। এর ব্যবহারের পদ্ধতি লক্ষ্য করুন।

ক] বাক্যে একই পদের একাধিক শব্দ থাকলে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন–

বিশেষ্য পদ

এবার রক্ষা কর তোমার কুল, মান, প্রাণ।

রেজা, রফিক, রায়হান – সবাই ফুটবল খেলতে গেছে।

বিশেষণ পদ

নীল আকাশ, সবুজ বন, ফুরফুরে হাওয়া – এসব ছেড়ে কি উঠতে ইচ্ছে করে।

সর্বনাম পদ

সে, তুমি, আমি তিনজনেই বিকেলে বেরিয়ে পড়বো।

ক্রিয়াপদ

খেলাম, ঘুমালাম, পড়লাম, বেড়ালাম – এতেই সারাদিন শেষ।

অব্যয়

হা হা, করে হাসলেই সব দু:খ ভুলে যাব ভেবো না।

(২) সমজাতীয় একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশে থাকলে কমা ব্যবহার করা হয়।

বসতে দিলে, শুতে চায়, শুতে দিলে, ঘুমাতে চায়।

দুই দুষ্ট সমবয়সী, সমান চালাক, সমান পাকা।

খাঁচার পাখি উড়তে চায়, উড়তে দিলে বনের মাঝে হারিয়ে যায়, আর ফিরে আসে না।

(৩) অসমাপিকা ক্রিয়াপদ পরপর বসলে কমার ব্যবহার হয়।

বলে-বলে, বকে-বকে, শেষে হাল ছেড়েছি।

(৪) বাক্যের প্রারম্ভে সম্বোধন থাকলে কমা বসে।

কল্যাণী, ঘর থেকে বইটা এনে দাওতো।

দীপু, তোর বাবা কোথায় রে?

(৫) উদ্ধৃতি চিহ্নের পূর্বে কমা বসে।

তিনি বললেন, "তোমাদের কাছে এমন ব্যবহার আশা করিনি।"

(৬) বাক্যের সূচনায় সুতরাং, বিশেষত, মুখ্যত ইত্যাদি পদের পরে কমা বসে।

সুতরাং, তোমার কোন কথা আমরা শুনবো না।

বিশেষত, তিনি যখন এ গ্রামের মাথা, তাঁকে অমান্য করা যাবে না।

(৭) নামের শেষে উপাধি, পদ পরিচয় ও পেশার উল্লেখ থাকলে কমা বসে।

অধ্যাপক আবুল হায়াত, এম.এ. পি.এইচ. ডি
খায়রুল আনাম খান, মুনসেফ, সুনামগঞ্জ।
(৮) ঠিকানা লিখতে
দাদা ভাই স্টোর, ১৪৪ নং, নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫
(৯) অনেকগুলো কার্যকারণ একত্র বসলে কমা থাকে।
'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, শাস্ত্রের বচন।

সেমি কোলন

কমার চেয়ে একটু বেশি কিন্তু দাঁড়ির চেয়ে কম সময়ের জন্য সেমিকোলনে থামতে হয়। শব্দ বা পদের পরে সেমিকোলন বসে না। সাধারণত বাক্যাংশে পরে সেমিকোলন বসে।

দুটি বাক্যের মধ্যে অর্থের নৈকট্য থাকলে।
ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল; কিন্তু দুরন্ত স্বভাবের।

বাক্যগুলোর মধ্যে একই ভাব থাকলে।
দিনকাল ভাল যাচ্ছে না; ব্যবসায়ে প্রতিমাসেই ক্ষতি হচ্ছে।
বছরটা ভাল যাবে; এবারে ভাল ফসল হবে।
প্রবাদ-প্রবচন বাগধারা দিয়ে দুটি বাক্য সংযুক্ত করলে সেমিকোলন বসে।
সমাজে সৎ লোক পাওয়া মুস্কিল; ঠক বাছতে গাঁ উজাড়। এমন সুদর্শন ছেলের সঙ্গে কিনা ঐ কুরূপা মেয়ের বিয়ে; এ যে বানরের গলায় মুক্তোর হার।
সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত না হলে সেমিকোলন বসে।
আগে চাই লেখাপড়া; পরে গান বাজনা।
বাক্যে বৈপরীত্য প্রকাশ করতে সেমিকোলন ব্যবহার হয়।
সে অসুখে ভুগছে; তাই সমিতিতে আসতে পারে না।

৪. কোলন ও কোলন ড্যাশ

উদ্ধৃতি অথবা দৃষ্টান্ত বোঝানর জন্য কোলনের ব্যবহার হয়।
সাধুর উপদেশের মর্মবাণী ঃ মানুষকে ভালবাস।
কারক ছয় প্রকার ঃ যথা– কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

৫. জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন

সংশয়সূচক শব্দ ব্যবহারে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে।
এ কি সেই মোগল সম্রাট শাজাহান? যার ইঙ্গিতে মাত্র গোটা ভারত কেঁপে উঠতো?
প্রশ্নবাচক বা জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যের শেষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসে।
তোমার নাম কি?
তোমাদের গ্রাম আর কতদূর?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

বিস্ময়সূচক বাক্যের পরেও জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসে।
ও কি, সকাল বেলাতেই ঝগড়া শুরু করেছো?

জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যে একাধিক শব্দে প্রশ্ন থাকলে প্রতিটি শব্দের পরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসে?
সে তাহলে কি? পিশাচ? দেবতা?

৬. বিস্ময়সূচক চিহ্ন

ক] আনন্দ, বিষাদ দু:খ, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি বুঝতে বাক্যের শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে।
ও! মরি মরি! কি সুন্দর এই দৃশ্য!
হায়! আমার কপালে এত দু:খ লিখেছ বিধি!

৭. ড্যাস

বাক্যের মধ্যে গতির প্রয়োজনে ড্যাস ব্যবহৃত হয়।
'বড় চড়ার বাঁদিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না– আমরা যাব কি করে'?
'চল তোকে ফিরে রেখে আসি – কাপুরুষ'।
প্রত্যক্ষ উক্তি বোঝাতে ড্যাশ ব্যবহৃত হয়।
'আমার বড় কৌতূহল হইল, বলিলাম – যদি আমরা একবার দেখতে যাই, তাতে কি কোন আপত্তি আছে?'
বাক্যের মধ্যে ভিন্ন প্রসঙ্গ আসলে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহার হয়।
'হাত ভেরে চিত হয়ে থাকলেই হল – তাছাড়া মড়া-পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।'
উদাহরণ দিতে গিয়ে ড্যাশ চিহ্নের ব্যবহার হয়।
সমান ছয় প্রকার– দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

৮ লোপচিহ্ন

শব্দ বা পদের মধ্যস্থ কোন অক্ষর লোপ পেলে লোপচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এ চিহ্নের ব্যবহার খুবই কম।
যাব 'খন।
দু'বেলা ভাতই জোটে না – রেডিও কিনবো কি দিয়ে?

৯. ব্রাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন ( ) [ ]

বাক্যে সাধারণত প্রথম বন্ধনী ও তৃতীয় বন্ধনীর ব্যবহার হয়।
নিম্নোক্ত কারণে বন্ধনীর ব্যবহার প্রযোজ্য।
ক] বাক্যের কোন অংশের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে ব্রাকেটের ব্যবহার হয়।
দেশের সর্বত্র আইন আছে (তা রক্ষিত হোক আর না হোক)।
উদ্ধৃতির উৎস দেখাতে গিয়ে বন্ধনী ব্যবহার হয়।
আমি বৃদ্ধ সেজে তোমাদের উপদেশ দিতে চাইনে (আকাঙ্ক্ষা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
যে অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করার জন্য।
'যাকে আমরা বিবেক(বিচার শক্তি) বলি, তার ব্যবহার শিখতে হবে।'
নাটকে অভিনয়ের নির্দেশ ব্রাকেটে থাকে।
[হো হো করিয়া হাসিয়া] এখন আর কথা নয় বাবা।

১০. উদ্ধৃতি চিহ্ন

বক্তার বক্তব্য অবিকৃতভাবে তুলে ধরতে হলে উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার হয়।
শিক্ষক বলিলেন, "ঘন্টা পড়ার পর কোন ছাত্র ক্লাশের বাইরে যেতে পারবে না।"
ভাগিনা বলিল, "মহারাজ পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।"
অন্যের রচনা উদ্ধৃত করলে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করা বিধেয়।
"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।"
বাক্যের মধ্যে বাগধারা অথবা বিশেষার্থক শব্দ ব্যবহার করলে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে থাকে।
ইতিপূর্বে পাঁচ-ছয়দিন ইন্দ্র 'চুরিবিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নিবিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে।"

১১. হাইফেন

দুই বা তার চেয়ে বেশি পদের মধ্যে সংযোগ বা সমাস বোঝাতে হাইফেন ব্যবহৃত হয়।
কত নদ-নদী-পাহাড়-পর্বত--বন-বনানী- দেখেছি; কিন্তু মন ভরেনি।
কখনও কখনও দুটি শব্দের গভীর সম্পর্কের কারণে সংযোগ চিহ্ন ব্যবহার হয়।
প্রবল জল-তাড়নায় ছপাছপ শব্দ করিয়া চারখানা নৌকা চলিয়া গেল।"

১২. বর্জন চিহ্ন [....]

রচনার অংশবিশেষ বর্জন করা হলে সেখানে বর্জন চিহ্নের প্রয়োগ ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমত কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্দিষ্ট স্থানে লিখুন।

১. নিচের বাক্যগুলোতে দাঁড়ি বসান।

আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খটখট শব্দ করিয়া নড়িত দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত

২. নিচের বাক্যগুলোতে যথাস্থানে কমা বসান।

চাল ডাল মাছ সব্জী – সবই কিনেছি। তারা বর্বর হলে কি হবে দিল তাদের সাচ্চা খাঁটি সোনার মত। দলের একজন বলিল ওহে হরি ভুষণো পোয়ালার দরুণ কলা বাগানটা তোমার কি ফের জমা দিয়েচো নাকি?

৩. নিচের বাক্যগুলো জিজ্ঞাসা চিহ্ন বসান।

তোমার নাম কি বাড়ি কোথায় কি জন্য এসেছো এরা কারা কি চায় তারা কথা বলছো না কেন তোমাকে কি ভীমরতিতে ধরেছে

৪. উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার করুন

রাত পৌহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

কর্তা বললেন পুকুরের সব মাছ এখনই জাল দিয়ে ধরে ফেল।

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, দেখ দেখি বোন। যদি কোন বাদশাহ কিংবা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম।

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন।

১. আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খটখট শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত।

২. চাল, ডাল, মাছ, সব্জী – সবই কিনেছি। তারা বর্বর হলে কি হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মত। দলের একজন বলিল, ওহে হরি, ভুষনো গোয়ালার দরুণ কলা বাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচো নাকি?

৩. তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? কি জন্য এসেছো? এরা কারা? কি চায় তারা? কথা বলচো না কেন? তোমাকে কি ভীমরতিতে ধরেছে?

৪. "রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি?"

কর্তা বললেন, "পুকুরের সব মাছ এখনই জাল দিয়ে ধরে ফেল।" আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, "দেখ দেখি বোন। যদি কোন বাদশাহ কিংবা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম।"

বিরতিচিহ্ন প্রয়োগের কিছু নমুনা

১. তখনও ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে মুখস্থর বুক ধড়াস সন্ধ্যেবেলা ঘাড়ে চেপে বসেনি সেজদাদা বলতেন আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুরের সব পেড়োরা গড়গড় করে আওড়ে চলছে () আমি হই উপরে () তিনি হন নিচে তখনও বি এ ডি ব্যাড এম এ ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছায়নি।

উত্তর

তখনও ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে মুখস্থর বুক ধড়াস সন্ধ্যেবেলা ঘাড়ে চেপে বসেনি। সেজদাদা বলতেন, আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তারপর ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুরে সব পোড়োরা গড়গড় করে আওড়ে চলেছে () আমি হই উপরে, () তিনি হন নিচে, তখনও বি এ ডি ব্যাড, এম এ ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছায়নি।

২. কী হইল তোমার বিবি

রহীমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বসে ধান দিয়ে কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

উত্তর – কি হইল তোমার বিবি?

রহীমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায বলে,

ধান দিয়ে কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

৩. আজরের স্ত্রী খড়্গ হস্তে রোষভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন দেখিতেছিস ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম দেখিতেছিস তিনটি পুত্রের রক্তে এই খড়্গ রঞ্জিত করিয়াছি পরপর আঘাতে ারষ্টত: তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে পামর নিকটে আয় চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি

উত্তর

আজরে স্ত্রী খগড় হস্তে রোষভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন "দেখিতেছিস? ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম! দেখিতেছিস? তিনটি পুত্রের রক্তে এই খড়্গ রঞ্জিত করিয়াছি। পরপর আঘাতে স্পষ্টত: তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে। পামর নিকটে আয়। চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি।"

৪. হু এসব কি লেখা হচ্ছে শ্লেটে সতে ধরে নিয়ে আয়তো দুজনকে কান ধরে নিয়ে আয়

যে ভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল এবং যেভাবে বিপন্ন মুখ সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরু মহাশেয়র কাছে যাইতেছিল তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিল

গুরু মহাশয় বলিলেন হাসে কে হাসচো কেন খোকা এটা কি নাট্যশালা অ্যা এটা নাট্যশালা নাকি।

উত্তর

হুঁ এসব কি লেখা হচ্ছে শ্লেটে? – সতে, ধরে নিয়ে আয়তো, দুজনকে, কান ধরে নিয়ে আয়!

যে ভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটে লইয়া গেল, এবং যেভাবে বিপন্ন মুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাসচো কেন খোকা, এটা কি নাটশালা? অ্যা? এটা নাট্যশালা নাকি?

৫. জেল খানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর

চন্দরা কহিল একবার আমার মাকে দেখিতে চাই

ডাক্তার কহিল তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায় তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।

চন্দরা কহিল মরণ

উত্তর

জেল খানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর"?

চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব"।

চন্দরা কহিল, "মরণ!"

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. বিরাম চিহ্নের একটি সংজ্ঞার্থ লিখুন। বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কি?

২. তিন প্রকার বিরাম চিহ্নে প্রয়োগ বিধি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখুন।

৩. নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে যথাযথ বিরামচিহ্ন দিন।

১. অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল বাবু তোমার লড়কী কোথায় গেল

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙ্গাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্ত:পুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সস্নিগ্ধ নেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে খিসমিস কোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল সে কিছুতেই লইল না দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল

২. অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল কবে যাবি রে আসবি নে আর কখনো

রানীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল বলিল তুই যে বলিস নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড় ভাল গাঁ এমন নদী এমন মাঠ কোথাও নেই সেই গাঁ চেড়ে তুই যাবি কি করে

৩. ঘরে কিছু নেই ভাগাভাগি লুটালুটি আর স্থান বিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ দৃষ্টি বাইরের পানে মস্ত নদীটার ওপারে জেলার বাইরে প্রদেশেরও হয়তো বা আরো দূরে

৪. কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছলছল খলখল করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই

৫. ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল অ্যা

মা আবার ডাকিলেন ওরে ফটিক বাপধন রে

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল মা এখন আমার ছুটি হয়েছে মা এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি

৬. আমার বিশ্বাস শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই এমন কি এ ক্ষেত্রে দাতা কর্ণেরও অভাব নেই এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে সেখানে থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে

৭. এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে করবে কে প্রকাশক না ক্রেতা প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে সে ঝুঁকিয়া নিতে নারাজ এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ কিন্তু বই কিন কেউ তো কখনও দেউলে হয়নি

৮. সে ঘরে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল সর্বজয়া বলিল এলে এসো ভাত তৈরী খেয়ে আমায় উদ্ধার করো তারপর আবার কোন দিকে বেরুতে হবে বেরোও

বানান পদ্ধতি

ইউনিট ১৬

পাঠ ১ ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত বানান সংস্কারের বিশেষ দিক

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বানান সংস্কারের উদ্যোগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত নিয়মগুলো বলতে পারবেন।
- প্রস্তাবিত নিয়মগুলোর ত্রুটি নির্দেশ করতে পারবেন।

মধ্যযুগের সাহিত্যের পুঁথির লিপিকারেরা বানানের ক্ষেত্রে ছিলেন স্বৈরাচারী মনোভাবের অধিকারী– স্বাধীনতার পরিপূর্ণ স্বাদ তারা, এক্ষেত্রে অন্তত, পুরোটাই ভোগ করতে চাইতেন। তাদের এ মনোভাবের ধারাবাহিকতার সুবাদে বাংলাভাষী মানুষেরা বানান সম্পর্কে সতর্ক হবার সুযোগ পাননি বা প্রয়োজনও বোধ করেননি। কিন্তু এ দেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হবার পর এবং অভিধান সংকলনের প্রয়োজনে বাংলা বানানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবার একটি সম্ভাবনা দেখা গেল। তৎসম শব্দের বানান নিয়ে তেমন সমস্যা ছিল না– কারণ সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন ও অঙ্কুশ দুটোই সর্বদা সজাগ ছিল। সমস্যা দেখা দিল অতৎসম শব্দ অর্থাৎ অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ নিয়ে। ঐসব উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণ শব্দ আমাদের সাহিত্যে ঢুকে পড়লো স্রোতের মত– আহুত, অনাহুত উভয়ভাবেই। কিন্তু ঢুকলো নানাজনের হাত দিয়ে নানান চেহারা নিয়ে– ফলে অতৎসম শব্দের বানানে শৃঙ্খলা ঘুচে গেল প্রায়। এ সমস্যা অনুধাবন করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দেন বানান সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠনের। তাঁর পরামর্শক্রমে ১৯৩৫ সালে রাজশেখর বসুকে সভাপতি ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতি' গঠিত হয়। বানান-সংস্কার সমিতির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, বিধু শেখর ভট্টাচার্য, বিজয়চন্দ্র মুজমদার, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ সমিতির একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। সমিতি নানা শ্রেণীর লোকের, যাদের মধ্যে প্রেসের কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিও ছিলেন মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে বানান সংস্কারের জন্য যে প্রস্তাব পেশ করেন, তা পুস্তিকা আকারে ১৯৩৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। এক বছরের মধ্যে পুস্তিকাটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতির প্রস্তাবসমূহ সর্বমহলে সাদরে গৃহীত হয়নি– তৈরি করেছে নানামুখী বিতর্ক, তাতে অংশগ্রহণও করেছেন নানান ধরনের লোক। সমিতির প্রভাবশালী সদস্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় সহ আরো অনেকেই ঐ বানান-রীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ পণ্ডিত বানান-সংস্কার সমিতিরি সঙ্গে কোথাও কোথাও দ্বিমত পোষণ করলেও তাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেননি। আসুন এবার 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতির প্রস্তাবিত নিয়মগুলোর সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, তারপর সেগুলোর অন্তরত্রুটি ও বিতর্ক সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করবো।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়ম

১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব –রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না, যথা– অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, সর্ব।

২। সন্ধিতে ঙ-স্থানে অনুস্বার- যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্-স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ বিধেয়, যথা– 'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন, অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ।

৩। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব ঃ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত হবে না, যথা– 'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি'।

৪। হস্-চিহ্ন ঃ শব্দের শেষে সাধারণত হস্চিহ্ন দেয়া হবে না, যথা– 'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্-চিহ্ন দেয়া যেতে পারে। হ এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণত স্বরান্ত, যথা– 'দহ, অহরহ, কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্-চিহ্ন দেয়া উচিত যথা– 'শাহ্, তখ্ত, জেমস, বণ্ড। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলবে, যথা– যদি উপান্ত্য, স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা– 'কট্কট্, খপ্, সার্'।

বাংলায় কতকগুলো শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা– গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষে অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা– অচল, গভীর, পাঠ, কক, করিস, করিলেন। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হবে কি হবে না তা বুঝাবার জন্য কেউ চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্-চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলা ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত-উচ্চারণ হবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা– বাই-ল। কিন্তু প্রভেদরক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্- চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হস্-চিহ্ন বিধেয়।

৫। ই ঊ উ ঊ- যদি মূল সংস্কত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসম শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হবে, যথা– কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চূন, পূব্বা কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব। কিন্তু কতকগুলো শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হবে, যথা– নীলা(নীলক), হীরা(হীরক), দিয়াশলাই(দীপশলাকা), খিল(কীল), পানি(পানীয়); চুল(চূল), তাড়ু(তর্দূ, জুয়া(দ্যুত)।

(বর্তমানে বাংলা দীর্ঘস্বর বর্জন করে হ্রস্বস্বর ব্যবহারের প্রবণতা প্রবল। এসব শব্দে বর্তমানে কেবল হ্রস্ব ই-কার ও হ্রস্ব উ-কার ব্যবহৃত হচ্ছে।)

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হবে, যথা– কলূনী, বাহিনী, কাবুলী, কেরাণী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী। কিন্তু কতকগুলো শব্দে ই হবে, যথা– ঝি, দিদি, বিবি; কচি, মিহি, মাঝারি, চল্তি। পিসী, মাসী, স্থানে বিকল্পে পিসি মাসি লেখা চলবে।

(এসব শব্দে বর্তমানে কেবল ই-কার ব্যবহৃত হয়।)

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হবে যথা– বেঙাচি, বেজি, কাঠি, সুচি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি।

৬। জ য ঃ এই সকল শব্দে য না লিখে জ লেখা বিধেয়, যথা– কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া জোত, জোয়াল।

৭। ণ, ন – অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' হবে, যথা– কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার। কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, গু চলবে যথা– ঘুণ্টি, লুণ্ঠন, ঠাণ্ডা।

'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলবে। (বর্তমানে 'রাণী' বানানটি অচলিত)।

৮। ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি ঃ সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেয়া যেতে পারে, যথা– কাল, কালো, ভাল, ভালো, মত, মতো, পড়ো, পড়ো(পড়ুয়া বা পতিত)।

এ সকল বানান বিধেয়– এত, কত, যত, তত; তো, হয়তো; কাল (সময়, কল্য), চাল, (চাউল, ছাত, গতি), ডাল, (ডাইল, শাখা)

৯। ং ঙ ঃ 'বাঙ্গালা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি 'বাংলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয় প্রকার বানানই চলবে। হসন্ত-ধ্বনি হলে বিকল্পে ং ঙ বিধেয়, যথা– রং, রঙ, সং, সঙ, বাংলা বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা– 'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাই হোক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমন, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখলে আপত্তির কারণ নেই। রং-এর অপেক্ষা রঙের লেখা সহজ। রঙ্গের লিখলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসবে না, কারণ রঙ্গ ও রং-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু রং ও রঙ সমান।

১০। **শ ষ স** ঃ মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্‌ভব শব্দে শ, ষ বা স হবে, যথা আঁশ(আংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য) মশা(মশক), পিসী (পিতৃঃ স্বসা), কিন্তু কতকগুলো শব্দে ব্যতিক্রম হবে, যথা– মিন্‌সে (মনুষ্য), সাধ(শ্রদ্ধা)। sh স্থানে স, sh স্থানে শ হবে, যথা– আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শার্ট, শেক্‌স্‌পিয়র। কিন্তু কতকগুলো শব্দে বিকল্পে ব্যতিক্রম হবে, যথা– ইস্তাহার (ইশতিহার), গোমস্তা(গুমাশতাহ্), ভিস্তি (বিহিশ্‌তী), খ্রীস্ট, খ্রিষ্ট (Cshrist)।

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুটি বর্জন করলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সহজ হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্‌ভব শব্দে মূল অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহু প্রচলিত, এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতি সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতগুলো শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানানই দেখা যায়, যথা– সরবত, শরবত; সরম, শরম; শহর, সহর; শয়তান, সয়তান; পুলিস, পুলিশ। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে, যথা কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হবে, যথা– করিস, ফরসা(ফরশা), সরেস(সরেশ), উসখুস(উশখুশ)।

১১। **ক্রিয়াপদ** ঃ সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান প্রভৃতি অথবা বিকল্প 'করানো, পাঠানো' বিধেয়। চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল। বিকল্পে ঊর্ধ্ব কমা বর্জন করা যেতে পারে, এবং লাম বিভক্তি স্থানে লুম বা লেম লেখা যেতে পারে।

হ-ধাতু হয়, হন, হও, হস, হই। হচ্ছে, হয়েছে। হক, হন, হও, হ; , হচ্ছিল, হয়েছিল; (হবো, হবে। হেয়, হস, হতে, হয়ে হলে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু ঃ খায়, খান, খাও, খাস, খাই; খেয়েছে, খাক, খান, খাও, খা, খেরে, খেলাম, খেত, খাচ্ছিল, খেয়েছিল, খাব (খাবো), খাবে, খেয়ো, খাস, খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু ঃ দেয়, দেন, দাও, দিন, দিই, দিচ্ছে, দিয়েছে, দিক, দিন, দাও, দে; দিলে, দিলা,, দিত, দিচ্ছিল, দিয়েছিল; দেব(দেবো), দেবে, দিও, দিস, দিতে, দিয়ে, দিলে দেবার, দেওয়া।

ধু-ধাতু ঃ শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই; শুচ্ছে, শুয়েছে, শুক, শুন, শোও, শো; শুল, শুলাম, শুত শুচ্ছিল, শুয়েছিল; শোব(শোবো), শুয়ো, শুস; শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্-ধাতু ঃ করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে, করেছে, করুক, করুন, কর, কর্। করলে, করলাম। করত। করছিল। করেছিল। করব(করবো), করবে। করো, করিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

কাট্-ধাত ঃ কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটছে। কেটেছে,। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম, কাটত। কাটছিল। কেটেলিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটা।

লিখ্-ধাতু ঃ লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখিত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব(লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখরে, লেখবার, লেখা।

উঠ্-ধাতু ঃ ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠি। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা ধাতু ঃ করায়, করান, করাও করাস,করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম, করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করারে, করাবার, করান (করানো)।

১২। **কতকগুলি সাধু মব্দের চলিত রূপ ঃ** কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর, প্রভৃতি শবগুলি সাধু শব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্য প্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তার সাধু রূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয় যথা– পিছন, পিতল ভিতর, উপর। যার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা– কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উন্ন, পুরন।

নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut-এর u, cat-এর a এবং f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নেই। অল্প কয়েকটি নতুন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করলে মোটামুটি কাজ চলতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নে বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নেই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হলেই লেখার কাজ চলবে। যে সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলে আসছে সে-সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে, যথা– কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেণ্ড।

১৩। **বিবৃত অ (cut-এর u) ঃ** মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাঙ্গালা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা-ক্লাব (club), বাস্(bus), বাল্ব্(bulb), সার্(sir), থার্ড(third), বাজেট(budget), জার্মান(German), কাটলেট(cutlet), সার্কাস(circus), ফোকাস(focus), রেডিয়ম(radium), ফসফরাস(phosphorus), হিরোডোটস(Herodotus)।

১৪। **বক্র আ(বা বিকৃত এ cut-এর a)** মূল শব্দের বক্র আ থাকলে বাংলায় আদিতে 'অ্যা' এবং মধ্যে '্যা' বিধেয়, যথা– অ্যাসিড (acid), হ্যাট(hat)।

এইরূপ বানানে '্যা'-কে য-ফলা+আ-কার মনে না করে একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন মনে করা যেতে পারে,

১৫। **ঈ ঊ ঃ** মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা– সীল (seal), ঈস্ট(east), ঊস্টার (worcester), ার *ল(*spool)।

১৬। fv-f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা– ফুট (foot), ভোট(vote)। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f-এর তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হবে, যথা– ফন(von)

১৭। w-w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা– উইলসন(wilson), উড(wood), ওয়ে(way)।

১৮। য় ঃ নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটার' প্রভৃতি বানান চলতে পারে, কারণ য় লিখলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নাই।

১৯। s.sh- ১০ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২০। st- নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নতুন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা– স্টোভ(stove)

২১। z-z স্থানে জ বা জ বিধেয়।

২২। হস্-চিহ্ন - ৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের কতিপয় নিয়মের সমালোচনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের নিয়মেরর প্রথম নিযমটি নিয়ে সেকালে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। সংস্কৃতি পণ্ডিতেরা রেফ-এর এর পর দ্বিত্ব প্রয়োগের পক্ষে ছিলেন এবং তাঁরা প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন এ-নিয়মের বিরুদ্ধে; যাদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ এ-নিয়মটিকে গ্রহণ করে নিয়েছে, এতে করে বাংলা ভাষার মুদ্রণ সৌকর্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লিখতে গিয়ে অহেতুক বিলম্বের অবসান ঘটেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানানের নিয়মের দ্বিতীয় নিয়মটি মূলত সংস্কৃত শব্দ ভান্ডারের অন্তর্গত। সংস্কৃতে বিকল্প ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ নিয়মটি নতুন করে রচনার ফলে যেখানে সচরাচর অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর, সঙ্গম সঙ্ঘাত লিখিত হতো সেখানে বিকল্প বানানরীতি অহংকার, ভয়ংকর, সংগম, সংঘাত লিখিত হতে লাগলো– এতে জটিলতা বাড়লো বই কমলো না। এখন আমাদের চোখে পড়ে একই বানানের দুটি ভিন্নরূপ ঃ গঙ্গা ও গংগা, বঙ্গ ও বংগ, সঙ্গ ও সংগ – যা সব সময় সকলে অনুসরণ করতে বা কেউ লিখলে শুদ্ধ বলে মানতে চান না।

চতুর্থ নিয়মে বলা হয়েছে 'শব্দের শেষে সাধারন হস্-চিহ্ন দেওয়া হবে না। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি বিদেশী শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন ওস্তাদ, চেক, ডিশ, পকেট, টি-পট, মক্তব ইত্যাদি। এ বিধানের পরে অবশ্য সাবধান করা হয়েছে 'ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হস্-চিহ্ন বিধেয়, শাহ্ তখ্ত্, জেম্স্ বণ্ড্ ইত্যাদি। তবে সুপ্রচলিত শব্দে হস্ চিহ্ন না দিলেও চলবে - যেমন আর্ট, গভর্নমেন্ট, ারঞ্জ। কিন্তু কোন শব্দটি সুপ্রচলিত আর কোনটি নয়, তা নির্ণয় করা দুরূহ।

উচ্চ শিক্ষিত লোকের কাছে 'ারঞ্জ' হয়তো উচ্চারণে কোন সমস্যা নয় কিন্তু এর অনুসরণে কোন নবীন বিদ্যার্থী যে খঞ্জ কে খঞ্জ্ পড়বে না তার নিশ্চয়তা কি? সুতরাং সর্বত্র এ নিয়মটি কার্যকরভাবে প্রযোজ্য নয়।

পঞ্চম নিয়মটি সম্পর্কে বানান সমিতি ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। বানান সমিতিরি প্রভাবশালী সদস্য সুনীতিকুমার চট্টোচাপাধ্যায় এবং সমিতিরি প্রস্তাবক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল এ বিষয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা ছিল হ্রস্ব-ইকারের দিকে আর সুনীতিকুমারের ছিল দীর্ঘ-ঈ-কার প্রীতি। সুনীতিকুমারের লেখায় যেখানে পাওয়া যায় 'একটী, কলমটী, গাছটী, বা খুঁটিটী' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'টী'কে সব সময় 'টি' হিসেবেই লিখেছিলেন। এ ধরনের জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা বানান-সমিতির বিধানেই ছিল। তাঁরা বলেছিলেন "যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসমদৃশ শব্দে ' ু বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হবে; যথা কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, উনিশ, চুন, পূব অথবা কুমির, পাখি, বাড়ি শিষ, উনিশ, চুন পুব। অর্থাৎ ই-কার, ঈ-কার, উ-কার ও ঊ-কার নিয়ে যে জটিলতা রয়েছে তার কোন সুারষ্ট বিধি ব্যবস্থা দিতে তাঁরা ব্যর্থ হলেন। ফলে জটিলতা জটিলতর হয়ে দেখা দিল।

সংস্কার সমিতির ষষ্ঠ নিয়ম 'জ' ও 'য' নিয়ে। কিন্তু সেখানেও সর্বত্র সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বস্তুত ঐ বর্ণ দুটির উচ্চারণে কোন ধ্বনি-পার্থক্য বাংলাতে নেই। ফলে জাঁতা, জো, জোড়া লেখা হবে নাকি যাঁতা, যো, যোড়া লেখা হবে তা নির্দিষ্ট নয়।

একই ধরনের সমস্যা থেকে গেছে 'ণ' ও 'ন' নিয়ে সংস্কার সমিতির সপ্তম বিধানে। যেমন বর্ণ>বরন, প্রাণ>পরান, বর্ষণ> বরিষন, কাণ>কানা, কোণ> কোনা, দক্ষিণ >দক্ষিনা, পুণ্য > পুন্যি, মাণিক্য >মানিক শব্দগুলোতে বিকল্প বানানে কোন সুারষ্ট নীতি অনুসরণ করা হয়নি।

সংস্কার সমিতির দশম, নিয়মটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ও সুচিন্তিন্ত। শ, স ও ষ নিয়ে যে জটিলতা রয়েছে বাংলা বানানে, তা অনেকখানি প্রশমিত হয়েছে। বিধানটিতে বলা হয়েছে 'মূল সংস্কৃত অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা– আঁশ<অংশু, আঁষ<আমিষ, মশা<মশক, সরিষা <সর্ষপ। বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম ও ২০ সংখ্যক নিয়মটি একটি সাম্য সৃষ্টি করতে পেরেছে। বিদেশী শব্দের sh এর বেলায় বাংলায় শ এবং st এর বেলায় 'স্ট' ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলনের ফলে বর্তমানে বানানে একটি সাম্য তৈরি হয়েছে। তবে police শব্দের 'ce` এর

উচ্চারণ নিয়ে এখনো জটিলতা রয়েছে প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে। কারণ সাম্প্রতিক দৈহিক পত্রিকাগুলোতে 'পুলিশ ও 'পুলিস' এবং 'ক্লাস ও 'ক্লাশ' বানান দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও একটি প্রবিধি থাকা প্রয়োজন।

বানান-সংস্কারের বিধানগুলো প্রচলিত হওয়ার পূর্বে বাংলা ক্রিয়াপদের বানানে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল দুঃসহ। সংস্কার সমিতির একাদশ নিয়ম সেক্ষেত্রে একটি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেও এখনো পর্যন্ত ক্রিয়াপদের বানানে প্রত্যাশিত স্থিরতা আসেনি। কারণ করি, কোরি, ক'রি, ধরি, ধোরি, ধরি, হব, হবো, হল, হ'ল, হোল, হলো, হোলো এ ধরনের বানান এখনো দেখা যাচ্ছে।

চতুর্দশ নিয়মে বলা হয়েছে 'বক্র আ (বা বিকৃত এ, cut-এর a) : মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়, যথা– অ্যাসিড, হ্যাট। 'অ্যা' ধ্বনিটি নিয়ে বাংলায় একটি সমস্যা রয়েছে কারণ বাংলায় ধ্বনিটির জন্য কোন আলাদা বর্ণ নেই। ফলে নানা সময়ে এ্যাসিড, ঢ্যাসিড, অ্যাসিড, অ্যাডিস বানানও দেখা যায়। এ-ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানান সংস্কারের বিধানগুলো সমকালে এবং এখনো পর্যন্ত নানা বিতর্ক সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। অনেকেই তাদের বানান রীতিকে গ্রহণীয় বলে বিবেচনা করেন নি এবং অগ্রহণের কারণও তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন যুক্তিযুক্তভাবেই। তবে একথা সত্য যে, বাংলা বানানের জটিলতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত ঐ বানানরীতিই পরবর্তীকালে বানান সংস্কারের পথকে সহজ করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান সংস্কারের একটি প্রধান দুর্বলতা ছিল : তাঁরা প্রচুর পরিমাণে বিকল্প বানানের অবকাশ রেখেছিলেন। যখনই বিকল্পের অবকাশ থাকে সঙ্গে সঙ্গে তার বিচ্যুতিরও সম্ভাবনা থাকে এবং অধিকাংশ সময়ই কোন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর বাংলা বানানের এখনো পর্যন্ত প্রধান সমস্যা অনৈক্য ও সমরূপতার অভাব। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানানের নিয়মগুলো বাঙালিকে একদিকে যেমন বানানের ঐক্য ফিরিয়ে এনে সমরূপতা দানের বিষয়ে সচেতনতা প্রদান করেছে পাশাপাশি অনৈক্য ও অসমরূপতা তৈরির স্বীকৃতি দিয়েছে। যা নিয়মের আন্তরিক শক্তি ও স্থিতিকে বিনষ্ট করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি গঠিত হয় কত সালে?
ক) ১৯৩০ খ) ১৯৩৫ গ) ১৯৪০ ঘ) ১৯৪৫

২। বাংলা বানানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ ঘটে–
ক) ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর খ) লেখকদের সচেতনতার মাধ্যমে
গ) অভিধান সংকলনের প্রয়োজনে ঘ) ক ও গ-এ বর্ণিত দুটো কারণেই

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত বানানের নিয়ম পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়–
ক) ১৯৩৬ সালে জানুয়ারি মাসে খ) ১৯৩৬ সালে মে মাসে
গ) ১৯৩৫ সালে মার্চ মাসে ঘ) ১৯৩৬ সালের মে মাসে

৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির প্রভাবশালী সদস্য কে ছিলেন?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ) হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘ) বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

৫। কার পরামর্শে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি গঠন করে?
ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ) হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

৬। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয় না– এই নিয়ম অনুসরণ করে নিচের বানানগুলো শুদ্ধ করুন।
ক) অর্চ্চনা ----------. খ) কার্যালয় ----------.
গ) মূচ্ছা ----------. ঘ) সূর্য্য ----------
ঙ) অর্জ্জুন ----------. চ) কর্ম্ম ----------.
ছ) ধর্ম্ম ----------. জ) কার্ত্তিক ----------.
ঝ) বার্ধ্বক্য ----------. ঞ) সর্ব্ব ----------.

৭। বিদেশী শব্দে St স্থানে সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয় এই নিয়ম অনুসরণ করে নিচের শব্দগুলোর বাংলা প্রতিবর্ণকরণকৃত রূপ লিখুন। যেমন : Stove স্টোভ

ক) Star খ) Station
গ) Photostat ঘ) Studio
ঙ) Stationery চ) Steel
ছ) Master জ) Store
ঝ) Restaurant ঞ) Stadium
ট) Student ঠ) Stove

পাঠ ঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক গৃহীত বানান রীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গৃহীত বাংলা বানান সংস্কারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পাঠ্য পুস্তকে অনুসরিত বানান রীতির তাৎপর্য লিখতে পারবেন।
- বানানের বিভিন্ন নিয়ম আয়ও করে আপনার লেখায় তা প্রয়োগ করতে পারবেন।

১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানানের নিয়ম প্রবর্তিত হবার পর তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা-সমালোচনা, উত্তাপ-নিরুত্তাপ, পক্ষে-বিপক্ষে প্রচুর বাক্য বিনিময় হয়। দেব প্রসাদ ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতির সুপারিশকে কোথাও কোথাও মেনে নিয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রমণ করে 'বাঙ্গালা ভাষা ও বানান' গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি মূলত বানানের পরিবর্তন-বিরোধি যে মহল ছিল তাদের পক্ষ নিয়েই ঐ গ্রন্থটি রচনা করেন। মণীন্দ্রকুমার ঘোষও তাঁর 'বাংলা বানান' (১৩৮৫-৯৩) গ্রন্থটিতে প্রধানত আলোচনা করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত বাংলা বানান সংস্কারের নিয়মনীতিগুলোর অন্তর-ত্রুটি ধরা পড়েছে। পরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাঙলা বানানবিধি' (১৯৮২) বইটিতে বাংলা বানানের সমতা বিধানের ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও তার নিয়মরীতি প্রয়োগ করে দেখিয়েছে যে ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি বানান সমস্যার ক্ষেত্রে একটি সহজ সমাধান হতে পারে। বাংলা বানানের সমস্যা সংকুল এলাকা হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র বিজ্ঞাপন ও পোস্টারের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য। তিনি দেখিয়েছেন যে ছাত্র-শিক্ষক লেখকদের অনুসৃত সমান্তরাল বানানের আদর্শ এতোটাই বিভ্রান্তিকর যে সর্বৈব বিশৃঙ্খলা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি তাঁর গ্রন্থে বাংলা বানানের সমতা বিধান ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য কয়েকটি পূর্বশর্তের কথা বলেছেন। সেগুলো হচ্ছে : প্রথমত, অনুস্বারের সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তাকে উপেক্ষা না করা; তৃতীয়ত, হস্-চিহ্নের ব্যবহার, উর্ধ্বকমার ব্যবহার এবং ও-কারের ব্যবহার অযথা না করা; চতুর্থত, উচ্চারণানুগ বানান যে বাংলায় সর্বত্র অনুসরণ করা সম্ভব নয় এ-সত্যকে স্বীকার করে নেয়া। 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা'(১৩১৪) পবিত্র সরকারের এ গ্রন্থটি পূর্ববর্তী তিনটি বইয়ের মত কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কারের নিয়মনীতিগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয়। বরং বাংলা বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে গত পঞ্চাশ বছরে যে সমস্ত সমস্যা ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে তিনি ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়াও বিগত কয়েক বছরে বানান বিষয়ে বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ১. রমেন ভট্টচার্যের 'বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম'(১৯৯০); ২. মাহবুবুল হকের 'বাংলা বানানের নিয়ম'(১৯৯১); ৩. আনন্দ বাজার পত্রিকার প্রস্তাবিক 'বানানবিধি' ৪. অরুণ সেনের বাঙলা বানান ও বিকল্প বর্জন' (১৯৯১); ৫. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বাংলা : কী লিখবেন কেন লিখবেন' (১৯৯১) প্রভৃতি। এ সব গ্রন্থের মধ্য দিয়ে একটি বিষয় প্রমাণিত হয়, বানানের সমরূপতা এখনো তৈরি হয়নি এবং এখনো তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনার অবকাশ রয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

কিন্তু নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা বানানের জটিলতা একটি মারাত্মক হুমকি : তারা এতো বিকল্প, এতো রূপান্তর, এতো বিকৃতি ও বিশৃঙ্খলা দেখলে স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্ত হতে পারে। এদের কথা বিবেচনা করেই বিদ্যালয় পর্যায়ের সকল পাঠ্য বইয়ে একটি অভিন্ন বানানরীতি প্রচলনের প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৯৭৪ সালের কুদরাত-ই খোদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে এবং ১৯৭৬ সালের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টে পাঠ্যপুস্তকের মনোন্নয়ন ও নবীন শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের অন্তরায় দূর করার উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট বানানরীতি প্রণয়ন ও তা অনুসরণ কারা বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাঠ্যপুস্তকে বানানের সমতাবিধানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। তাঁরা অভিন্ন বানানের জন্য কিছু নিয়ম সুপারিশ করেন এবং সে সঙ্গে অনেকগুলো যুক্তবর্ণের অন্তর্ভুক্ত বর্ণগুলো রাষ্টীরূপ মুদ্রণের ক্ষেত্রেও সব জায়গায় সাফল্য পাওয়া যায় নি। এ সকল সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে ইউনিসেফের সহায়তায় ১৯৮৮ সালের ২১ থেকে ৩০ অক্টোবর কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে প্রায় ৫০ জন শিক্ষক, সাহিত্যিক সাংবাদিক, ভাষাবিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা প্রশাসককে নিয়ে একটি জাতীয় কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয়। ঐ জাতীয় কর্ম শিবিরে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে কিভাবে পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতা বিধান করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর কর্মশিবিরে ২৪ দফা নিয়ম সুপারিশ করা হয়। নিচে ১৯৮৮ সালে বানানের সমতা বিধানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সুপারিশমালা প্রদান করা হল ঃ

সুপারিশমালা

পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের জন্য নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হবে :

১. রেফের পর কোথাও ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন– কর্ম, কার্য, শর্ত, সূর্য।

২. সন্ধিতে প্রথম পদের পদের শেষে ম্ থাকলে ক-বর্গের পূর্বে ম্ স্থানে ং লেখা হবে। যেমন, অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত। অন্যান্য ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ এবং ক্ষ-র পূর্বে নাসিক্যবর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র ঙ লেখা হবে। যেমন, অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, সঙ্গে। প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে অনুস্বার ব্যবহৃত হবে। যেমন– রং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তিযুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরবর্ণ থাকলে ঙ হবে। যেমন, বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

৩. হস্‌চিহ্ন ও উর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন– করব, চট, দুজন।

৪. যে শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর অভিধানসিদ্ধ, সে ক্ষেত্রে এবং অ-তৎসম ও বিদেশী শব্দের বানানে শুধু হ্রস্ব স্বর প্রযুক্ত হবে। যেমন– পাখি, বাড়ি, হাতি।

৫. ক্ষ-বিশিষ্ট সকল শব্দে ক্ষ অক্ষুণ্ন থাকবে। যেমন– অক্ষয়, ক্ষেত, পক্ষ।

৬. কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন– গাভী, রাণী, হরিণী, কিঙ্করী, পিশাচী, মানবী।

৭. ভাষা ও জাতির নামের শেষে-ই কার থাকবে। যেমন– ইংরেজি, জাপানি, বাঙালি

৮. বিশেষণবাচক 'আলি'-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন– বর্ণালি, রূপালি, সোনালি।

৯. পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি'-তে ই-কার হবে। যেমন– লোকটি।

১০. অর্থভেদ বোঝাবার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন–কি (অব্যয়), কী (সর্বনাম); তৈরি (ক্রিয়া), তৈরী (বিশেষণ); নিচ (নিম্ন অর্থে), নীচ (অর্থে); কুল (বংশ অর্থে), কূল (তীর অর্থে)।

১১. বাংলায় প্রচলিতকৃত ঋণ বিদেশী শব্দ বাংলাভাষার ধ্বনি পদ্ধতিতে লিখিত হবে। যেমন– কাগজ, জাহাজ, হাসপাতাল। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে :

ক) ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত নিম্নলিখত শব্দে যে, 'যোয়াদ' ও 'যাল'-এর জন্য য (ইংরেজি () ধ্বনির মতো) ব্যবহৃত হবে। যেমন– আযান, এযিন, ওযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যাকাত, যিকির, যোহর, রমযান, হযরত।

খ) অনুরূপ শব্দে আরবি 'সোয়াদ' ও 'সিন'-এর জন্য স এবং 'শিন'-এর জন্য শ হবে। যেমন সালাম, মসজিদ, সালাত, এশা।

গ) ইংরেজি এবং ইংরেজির মাধ্যমে আগত () ধ্বনির স, () প্রভৃতি ধ্বনির জন্য শ এবং () ধ্বনির জন্য স্ট যুক্তবর্ণ লেখা হবে।

ঘ) ইংরেজি বক্র () ধ্বনির জন্য শব্দের প্রারম্ভে এ ব্যবহার্য। যেমন– এলকহল, এসিড।

ঙ) () ও () শব্দের বাংলা রূপ হবে খ্রিস্ট ও খ্রিস্টান। এই নিয়মে খ্রিস্টান হবে।

১২. পূর্ববর্তী নিয়মের (ক) থেকে (ঘ) পর্যন্ত বর্ণিত বিধি ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে। তা ছাড়াও সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে ণত্ব-ষত্ব বিধি অনুসরণ করা হবে না। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কেবল ণ(যেমন- কাণ্ড, ঘণ্টা এবং ত-বর্গের পূর্বে কেবল ন (যেমন– তন্ত্র, পান্থ) লেখা হবে। অনুরূপভাবে, শিষধ্বনি যুক্ত করার জন্য চ-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল শ (যেমন– নিশ্চয়, নিশ্ছিদ্র) ট-বর্টের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল ষ (যেমন– কষ্ট, কাষ্ঠ) এবং ত-বর্গের অঘোষধ্বনির পূর্বে কেবল স (যেমন– অস্ত, আস্থা) ব্যবহৃত হবে।

১৩. পদান্তে বিসর্গ থাকবে না। যেমন– ক্রমশ, প্রধানত, মূলত।

১৪. ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার অপরিহার্য নয়। যেমন– করব, হল ইত্যাদি। এত, মত, কোন প্রভৃতি শব্দে ও-কার আবশ্যক নয়। তবে বর্তমান ও ভবিষ্যত অনুজ্ঞায় ও-কার রাখা যাবে। যেমন করো, কোরো, বলো, বোলো।

১৫. ব্যঞ্জনবর্ণে উ-কার (ু) ঊ-কার (ূ) ও ঋ-কারের (ৃ) একাধিক রূপ পরিহার করে এই কারগুলি বর্ণের নিচে যুক্ত করা হবে। যেমন– শুভ, রূপ, হৃদয়।

১৬. যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ করার জন্য প্রথম বর্ণের রূপ ক্ষুদ্রাকারে এবং দ্বিতীয় বর্ণের রূপ পূর্ণরূপে লিখিত হবে। যেমন– অঙ্ক, সঙ্গে, ারষ্ট।

১৭. যে সব যুক্তব্যঞ্জন বাংলা উচ্চারণে নতুন ধ্বনি গ্রহণ করে। যেমন– ক্ষ(ক্+ষ), জ্ঞ(জ্+ঞ) হ্ম (হ্+ম), সেগুলির রূপ অক্ষুণ্ন থাকবে। তাছাড়া নন্দনাত্ত্বিক বিচারে ঞ্চ (ঞ্+চ), ঞ্ছ (ঞ্+ছ), ঞ্জ (এ্+জ), ট্ট (ট্+ট), ট্র (ট্+র), ত্ত (ত্+ত), থ (ত্+থ), ত্র (ত্+র), ভ্র (ভ্+র), হ্ণ (হ্+ণ), হ্ন (হ্+ন), ষ্ণ (ষ্+ণ) ইত্যাদি যুক্তবর্ণের প্রচলিত রূপও অক্ষুণ্ন রাখা হবে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জন গঠনের রূপ ব্যাখ্যা করা হবে।

১৮. সমাসবদ্ধ পদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন– জটিলতামূলক, বিজ্ঞানসম্মত, সংবাদপত্র। অর্থগতভাবে একক হলেও তা একসঙ্গে লেখা হবে। যেমন– ষোলকলা। প্রয়োজনবোধে শব্দের মাঝখানে হাইফেন দেওয়া যেতে পারে। যেমন– কিছু-না-কিছু, লজ্জা-শরম, সংগত-পাঠ-নির্ধারণ।

১৯. বিশেষণবাচক পদ(গুণ, সংখ্যা বা দূরত্ব ইত্যাদি বাচক) হলে সেটি আলাদা বসবে। যেমন– একজন কত দূর, সুন্দর ছেলে।

২০. নঞর্থক শব্দ পৃথকভাবে বসবে। যেমন– ভয়ে নয়, হয় না, আসেনি, হাতে নেই।

২১. হযরত মুহম্মদ (স)-এর নামের সঙ্গে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে (স), অন্য নবী ও রসুলের নামের পরে বন্ধনীর মধ্যে (আ), সাহাবিদের নামের রা) এবং বিশিষ্ট মুসলিম ধার্মিক ব্যক্তির নামের পরে (র) লিখতে হবে।

২২. লেখক ও কবি নিজের নামের বানান যেভাবে লেখেন বা লিখতেন, সেভাবে লেখা হবে।

২৩. বাংলাদেশের টাকার প্রতীকচিহ্নের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অঙ্কের বইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বইতে তার মূল-নির্দেশক সংখ্যার পূর্বে টাকার চিহ্ন () ব্যবহার করা হবে।

২৪. পূর্ববর্ণিত নিয়মাবলির বহির্ভূত শব্দের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অভিধানগুলিতে প্রদত্ত প্রথম বানান গ্রহণ করা যেতে পারে :

চলন্তিকা : রাজশেখর বসু

ব্যবহারিক শব্দকোষ : কাজী আবদুল ওদুদ

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, দু খণ্ড : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

বাঙলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দ সঙ্কলন : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল

পারসো-এরাবিক এলিমেন্টস ইন বেঙ্গলি : গোলাম মকসুদ হিলালী।

জাতীয় কর্মশিবিরে গৃহীত বানানের নীতিমালা অনুযায়ী একটি শব্দ তালিকা প্রণয়নের পর তা কর্মশিবিরে উপস্থিত সদস্যদের মহামদের ভিত্তিতে চূড়ান্ত করার কথাও সুপারিশে বলা হয়েছিল। শব্দ সংকলন করতে গিয়ে চূড়ান্তকারী কমিটি কর্মশিবিরে গৃহীত বানানের নিয়মাবলির কোন কোনটি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করেছেন। যেমন ৪ সংখ্যক নিয়মে

বলা হয়েছে, যে সব শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়স্বর অভিধান সিদ্ধ সেখানে শুধু হ্রস্বস্বর প্রযুক্ত হবে। তবে বহুল প্রচলিত কিছু শব্দে এ-কার সিদ্ধ হলেও ঈকার রাখা যেতে পারে। কমিটি প্রচলনের কারণে অন্তরীক্ষ, গাভী, মারী, পল্লী ও শ্রেণী শব্দে দীর্ঘস্বর রাখাই সুবিধাজনক মনে করেছেন। এ বিধি তারা কিছু কৃতঋণ শব্দে ব্যাপকভাবে প্রচলনন থাকায় ঈ-কার গ্রহণ করেছেন। যেমন ঈদ, একাডেমী, নবী, পরী, পীর, ফী(অর্থ), বীমা, লীগ, শহীদ, শাস্ত্রী, ারীকার প্রভৃতি। কৃতঋণ শব্দ বলেই ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান অনুসরণ না করে তারা ইঞ্জিন, মঞ্জুরী, ঠাণ্ডা, প্রেসিডেন্ট ও লণ্ঠন ব্যবহার করেছেন। অবশ্য যেখানে যুক্ত ব্যঞ্জন ভেঙ্গে লেখা হয়েছে সেখানে 'ন'-ই রাখা হয়েছে। যেমন সিলিনডার, পেনডুলাম ইত্যাদি।

সুপারিশের ১১ সংখ্যক বানানের নিয়মে বলা হয়েছিল, ইংরেজি বক্র () ধ্বনির জন্য সর্বত্র এ ব্যবহার করতে হবে। এ নিয়মের ফলে () ও () উভয় শব্দেরই বাংলায় প্রতিবণীকরণ কৃত রূপ হয় এণ্ড। এতে উচ্চারণ ও অর্থগ্রহণ দুক্ষেত্রেই সমস্যা তৈরি হয়। এ-জন্য যে ক্ষেত্রে উচ্চারণে সমস্যা তৈরির সম্ভাবনা থাকবে সেখানে বক্র ()-এর জন্য অ্যা ব্যবহার করেছেন। যেমন– অ্যাকসিডেন্ট, অ্যারেস্ট, অ্যালাউন্স প্রভৃতি।

তবে সে সব শব্দে বক্র ()-এর জন্য বাংলায় ব্যাপকভাবে এপ্রচলিত সে সব শব্দে বিকল্পে এ রাখা হয়েছে। যেমন– একাডেমী, এডভোকেট, এডমিরাল, এভিনিউ, এসিড ইত্যাদি।

শিক্ষাঙ্গণ ও সমরাঙ্গণ প্রভৃতির মত যে সমস্ত শব্দে অন্তে, 'ন' ও 'ণ' উভয়ই সিদ্ধ সেক্ষেত্রে কমিটি 'ণ' ব্যবহারের পক্ষেই মত দিয়েছেন। তা ছাড়া আমাদের হস্তলিপি ও মুদ্রণের গ+ণ ও গ+ন এর যেহেতু 'গ্ন'-রূপেই দেখা যায় তাই 'রুগ্ন' শব্দের বানান যুক্ত বর্ণটি ভেঙে 'রুগ্ণ' লেখার পরামর্শ দিয়েছেন।

বানানের ১৪ সংখ্যক নিয়মে বলা হয়েছে ক্রিয়াপদের বানানে ও-কার অপরিহার্য নয়। কিন্তু ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষের সামান্য ও তুচ্ছ রূপের পার্থক্য দেখানোর জন্যে এবং অনুজ্ঞা ও প্রযোজক ক্রিয়ার পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য ও-কার অনিবার্য হয়ে পড়ে। যেমন– নাচ ও নাচো, পড় ও পড়ো, বল ও বলো। একইভাবে করান ও করানো, খাওয়ান ও খাওয়ানো, দেখান ও দেখানো ও দেখানো, পাঠান ও পাঠানো বানানের ভিন্নতা প্রয়োজনীয়। কমিটি বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য কিছু বিশেষ্য, বিশেষণ ও অব্যয় শব্দেও ও-কার দেওয়ার কথাও বলেছেন। যেমন– কাল ও কালো, কোন ও কোনো, ভাল ও ভালো, মত ও মতো এবং শুধু 'ত' দিয়ে নয় হয়তো, নয়তো প্রভৃতি রূপ গ্রহণ করার কথা বলেছেন।

বানানের ১৭ সংখ্যক নিয়মে বলা হয়েছিল ক্ষ, জ্ঞ ও হ্ম এ-তিনটি যুক্ত ব্যঞ্জন মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ রূপ বজায় থাকবে। মুদ্রণের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবস্থা প্রচলনের কারণে হ্ম-কে তাঁরা হ+ম রাখার প্রস্তাব করেছেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক বাংলা বানানের সমতা বিধানের ক্ষেত্রে যে সুপারিশ করেছেন তার একটি প্রধান সুবিধা হচ্ছে গৃহীত বানান রীতিতে তাঁরা যতদূর সম্ভব বিকল্প বানান পরিহার করেছেন। শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে বানানের অসমরূপতা ও বিশৃঙ্খলা যেমন একটি অন্তরায় তেমনি একটি বানানের একাধিক অভিধান সিদ্ধ বিকল্প রূপও সমানভাবে দায়ী। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে যদি অভিন্ন বানান রীতির সঙ্গে শৈশব হতেই পরিচিত করে তোলা যায় তবে ভাষায় দক্ষতা অর্জন তার জন্য সহজ হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সুপারিশ মালায় সে চেষ্টাই প্রতিফলিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. পাঠ্যপুস্তকের বানানের সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে?

ক) ১৯৮২ খ) ১৯৮৪

গ) ১৯৭৪ ঘ) ১৯৭৬

২. কুদরাত-ই খোদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট কত সালে পেশ করা হয়?

ক. ১৯৭২ খ) ১৯৭৪

গ) ১৯৭৬ ঘ) ১৯৭৮

৩. নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য বানানের জটিলতা কেন হুমকি হিসাবে বিবেচিত হয়?

ক) তারা বানান আয়ত্তের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হতে পারে।

খ) তাদের ভাষিক দক্ষতা অর্জন বিলম্বিত হয়।

গ) তারা মাতৃভাষার আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

ঘ) ওপরের সবগুলোই

৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রস্তাবিত বানানের প্রধান সুবিধা হল–

ক) ঐ বানান রীতি আয়ত্ত করা সহজ

খ) ঐ বানান রীতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক

গ) ঐ বানান রীতিতে যতদূর সম্ভব বিকল্প পরিহার করা হয়েছে

ঘ) ঐ বানান রীতি লেখার জন্য সুবিধাজনক

৫. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ–এর বাংলা বইটির মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান রীতির–

ক) বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে খ) অন্তর-ক্রটি ধরা পড়েছে

গ) সংস্কার সাধিত হয়েছে ঘ) সার্বজনীনতা লাভ হয়েছে।

খ. অশুদ্ধি সংশোধন

১. নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধ রূপ প্রতিটির পাশে রাখা খালি জায়গায় লিখুন।

কার্য	কর্‌ব	ইংরেজি	বাঙালী	জাপানী
লোকটী	হাঁসপাতাল	খ্রিষ্টাব্দ	খ্রিষ্টান	য়্যাসিড
রূপালী	ছালাম	প্রধানতঃ	ক্রমশঃ	রুপ
সংবাদ পত্র	হয় না	করিনি	বিজ্ঞান সম্মত	এ্যাকাডেমী
মূলতঃ	কাগয	রাস্ট্র	জার্মানী	নদি
সোনালী	পাখীটা	চল্‌ব	ধার্য্য	খ্রিস্ট

পরিভাষা

ইউনিট ১৭

ভূমিকা

মনে করা যাক, একালের মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র কম্পিউটার নিয়ে কোথাও আলোচনা হচ্ছে, আর আপনি সেখানে একজন শ্রোতা। আলোচনা শুনতে শুনতে আপনি খেয়াল করলেন হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার, প্রোগ্রামিং, উইন্ডোজ, ডাটা, কমান্ড, হ্যাং, স্কিপ, ফাইল, ডিরেক্টরি এরকম বেশ কিছু শব্দ তাদের আলোচনায় ঘুরে ফিরে আসছে। আপনি আরো খেয়াল করলেন ঐ শব্দগুলো যারা আলোচনা করছেন তাঁরা যেভাবে এবং যে অর্থে ব্যবহার করছেন তার সঙ্গে আপনি পরিচিত নন। হয়তো আপনি শব্দগুলোর অর্থও দাঁড় করাতে পারছেন কিন্তু আপনার জানা অর্থের সঙ্গে আলোচনাকারীদের অর্থগত কোন মিল হচ্ছে না। না হবারই কথা। যদি আপনি কম্পিউটার সম্পর্কে কোন ধারণা না রাখেন তাহলে ঐ শব্দগুলো বেশ জটিল এবং অর্থহীনও মনে হতে পারে। আসলেই কি শব্দগুলো অর্থহীন। মোটেই নয়। যাদের কম্পিউটার সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা আছে তাদের কাছে কিন্তু ঐ শব্দগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ ধরা পড়ে। আপনিও যদি কম্পিউটার সম্পর্কে কোন পূর্ব ধারণা পোষণ করেন তাহলে আপনার কাছেও আমি যখন শব্দগুলোর কথা বলেছি, তখন খুব একটা অপরিচিত মনে হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতেই এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়, যে শব্দগুলো সাধারণভাবে আমাদের রোজকার কথা-বার্তায় ব্যবহৃত হয় না, বা প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু ঐ বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় শব্দগুলোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রায় অনিবার্য। যেমন কম্পিউটার সম্পর্কিত আলোচনায় এসেছে হ্যাং, ডাটা, স্কিপ, ফাইল ইত্যাদি শব্দ তেমনি হয়তো অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় চাহিদা, যোগান, বাজার, মুদ্রা এসব শব্দ ঘুরে ফিরে আসবে। অনেক সময় দেখা যায়, এই বিশেষ শব্দগুলোর ব্যবহার না করে ঐ বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করাই যাচ্ছে না। তাই এ ধরনের শব্দগুলোকে বলা হয় চাবি শব্দ (Key word) যেগুলোর একটি ছাড়া অন্য কোন অর্থ বা তাৎপর্য নেই। একটু খানি এগিয়ে অনেকটা সংজ্ঞার মত করে বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট ও অদ্ব্যর্থ তাৎপর্য জ্ঞাপনকারী শব্দই হচ্ছে ঐ বিশেষ জ্ঞানের পরিভাষা। হার্ডওয়্যার, সফট্ওয়্যার, ডাটাবেজ, হ্যাং এগুলো যেমন কম্পিউটার বিজ্ঞানের পরিভাষা তেমনি বাজার, যোগান, চাহিদা, মুদ্রা এগুলো অর্থনীতির পরিভাষা। আর পরিভাষাগুলো যেহেতু এক একটি শব্দ (যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়) সেজন্য আমরা সেগুলোকে পারিভাষিক শব্দও বলতে পারি। আসুন এবারে আমরা পরিভাষা নিয়ে খানিকটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- পরিভাষা বলতে কি বুঝায় এবং বাংলা পরিভাষার ইতিহাস বলতে পারবেন।
- পারিভাষিক শব্দগুলো চিনতে পারবেন।
- কিভাবে পরিভাষা সৃষ্টি হয় তা জানতে পারবেন।
- পরিভাষা সৃষ্টির নীতিমালা বলতে পারবেন।
- পরিভাষা কিভাবে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাঠ ১ ঃ পরিভাষার সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- পরিভাষার একটি সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- পারিভাষিক শব্দ চিনতে পারবেন।
- পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কাকে বলে পরিভাষা

আলোচনার শুরুতেই আমাদের জানা দরকার পরিভাষা কাকে বলে? আসল বিষয়টি বুঝবার জন্য আমরা প্রথমে দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তির দেয়া দুটো সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচিত হই এবং সেখান থেকে নিজেদের মত করে বিষয়টি বুঝে নেবার চেষ্টা করি।

ক) "অভিধানে 'পরিভাষা'র অর্থ সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোন বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা। যে শব্দের অনেক অর্থ, সে শব্দও যদি প্রসঙ্গ বিশেষে নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষা স্থানীয়। সাধারণত: 'পরিভাষা' বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলী বোঝায় যার অর্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শন বিজ্ঞানীদের আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না।" {রাজ শেখর বসু : বাংলা পরিভাষা]

খ) "ইংরেজিতে কথাটি যা বোঝায় তা হচ্ছে- A word (=ferm) connected with methods or objects used by experts in science, technology or arts by way of abberviation, অর্থাৎ বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যা, চারু ও কারুকলা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ব্যবহৃত বস্তু অথবা তাঁদের অবলম্বিত পদ্ধতির সহিত সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত শব্দ। উদাহরণ স্বরূপ লাতিন 'Alma-mater কথার উল্লেখ করা যায়। এর মৌলিক অর্থ 'সদাশয় জননী' হলেও, বর্তমানে এতে যা বোঝায় তা হচ্ছে। ছাত্রদের সেই বিদ্যালয় যাতে তারা শিক্ষা পেয়ে মানুষ হয়েছে।' মূলের সঙ্গে Technical Term-এর কোন প্রকারের সম্বন্ধ থাকা প্রত্যাশিত হলেও, তার সাথে কোন সম্বন্ধ না থাকলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।' [এনামুল হক :]

এবার আসুন আমরা ঐ দু'জন খ্যাতনামা পন্ডিতের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা থেকে নিজেদের মতো করে 'পরিভাষা'কে বুঝে নিই। 'পরিভাষা' শব্দটি আসলে ইংরেজি 'defination' শব্দের বাংলা অনুবাদ। এর কাছাকাছি আরেকটি শব্দ আমরা জানি technical term`-যার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে 'পারিভাষিক শব্দ'। আজকাল 'পরিভাষা' ও 'পরিভাষিক শব্দ- প্রায় একই অর্থ বুঝিয়ে থাকে; যদিও 'পরিভাষা' এই বিশেষ্যবাচক শব্দটির বিশেষণ হচ্ছে 'পারিভাষিক' ''পরিভাষা শব্দটি এদেশে ইংরেজ আসার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল সংজ্ঞা বাচক বিশেষ অর্থে। 'বাচারত্য' অভিধান অনুসারে 'পরিভাষা' শব্দের অর্থ হল 'শাস্ত্রাকারে সংজ্ঞা বিশেষ'। এ ছাড়া অন্য প্রাচীন অভিধানগুলোতেও শব্দটির যে অর্থ দেওয়া হয়েছে তার মূল কথা হল, অর্থান্তর নেই এমন বিশেষ অর্থবোধক সংজ্ঞার নাম পরিভাষা"। **বস্তুত পরিভাষা বলতে বোঝায় কোন বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহৃত এমন কিছু শব্দ যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষ বিশেষ ধারণাকে যথার্থভাবে, নির্ভুলভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করে। পণ্ডিতেরা একমত হয়ে একটি বিশেষ ধারণার** (Concept) **জন্য একটি বিশেষ শব্দকে বেঁধে দেন যে শব্দটি সংশয়হীনভাবে কেবল ঐ বেঁধে দেওয়া অর্থকেই বোঝাবে অন্য কোন অর্থ বোঝাবে না।** পরিভাষা হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের কাছে হাতিয়ার স্বরূপ যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠিক কথাকে ঠিকমত বোঝানো; ইংরেজিতে যাকে বলে hitting the nail on the head সাধারণ শব্দের সঙ্গে পারিভাষিক শব্দের পার্থক্য এখানেই। সাধারণ প্রয়োগে একই শব্দ দিয়ে একাধিক ভাব প্রকাশ করা যায় আবার একাধিক শব্দ দিয়েও একটিমাত্র ভাব প্রকাশ করা যায়। যেমন- 'মাথা' শব্দটি দিয়ে বোঝানো যায় গ্রামের মাথা, রাস্তার মাথা, চৌমাথা, দলের মাথা, মাথা খাওয়া, মাখা ধরা ইত্যাদি। এখানে 'মাথা' এই শব্দটি নানা অর্থে নানানভাবে প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আবার প্রেম, ভালবাসা, সম্প্রীতি, সখ্য, হৃদ্যতা, প্রণয়, আন্তরিকতা শব্দগুলো প্রায় একই রকম ভাব বোঝানোর (শব্দগুলোর মধ্যে যে সূক্ষ্ম অর্থগত পার্থক্য আছে তা যদি বিবেচনা না করি) জন্য এগুলো শব্দের যে কোন একটি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু পরিভাষার ক্ষেত্রে ঐ দুটো শব্দের মত কোনটিই হবার উপায় নেই– একটি 'পরিভাষা' বা পারিভাষিক শব্দ একাধিক অর্থে যেমন ব্যবহৃত হতে পারবে না, তেমনি একাধিক ভাব নির্দেশের জন্য একই পরিবাষা ব্যবহৃত হতে পারবে না। যেমন 'সমাস' বললে পরারর অর্থসঙ্গতি বিশিষ্ট একাধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। কিংবা 'কারক' বললে বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য শব্দের কোন না কোন প্রকাশের সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। তাই 'সমাস' বা 'কারক' বাংলা ব্যাকরণ শাস্ত্রের দুটি পারিভাষিক শব্দ। তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, বাণিজ্য প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই ব্যবহৃত হয় অসংখ্য পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ।

মনে রাখবেন

পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ

- সংক্ষেপে কোন বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করে;
- পণ্ডিতগণের সম্মতির মাধ্যমে স্থিরীকৃত;
- একটি মাত্র ভাবকেই কেবল প্রকাশ করে;
- একাধিক ভাবকে প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় না;
- মূলের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হলেও তার প্রযুক্ত অর্থই শব্দটির যথার্থ পারিভাষিক অর্থ।

কিভাবে চিনবেন পারিভাষিক শব্দ

আজকাল আমরা জেনেই হোক আর না জেনেই হোক পদে পদে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এসব পারিভাষিক শব্দ আপনি চিনবেন কি করে? একটু আগেই আমরা বলেছি জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতেই রয়েছে কিছু নিজস্ব পারিভাষিক শব্দ। যে শব্দগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কথাবার্তায় তেমন প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু ঐ বিশেষ জ্ঞানের আলোচনায় শব্দটি যদি অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তাহলেই বুঝতে হবে শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ। মনে করুন আপনি সমাস সম্পর্কে আলোচনা করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি 'পূর্বপদ', 'পরপদ, সমস্যমান পদ, ব্যাস বাক্য এসব শব্দের সাহায্য ছাড়া আপনি আলোচনাই করতে পারবেন না। সুতরাং আপনি ধরে নেবেন ঐ শব্দগুলো পারিভাষিক শব্দ।

সব সময় পারিভাষিক শব্দ আবার এতো সহজে চেনা যায় না। কারণ পারিভাষিক শব্দটির বহুল ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা। উকির, মোক্তার, আবাসিক, অনাবাসিক এগুলো যে পারিভাষিক শব্দ তা আজ আর আমাদের মনেই হয় না। একারণে পারিভাষিক শব্দ চেনার জন্য আমাদের প্রয়োজন খানিকটা অতিরিক্ত সতর্কতা। যখনই কোন পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হবেন, শব্দটি একাধিকবার আবৃত্তি করে মনে গেঁথে নিন, প্রয়োজনে একটি নোট খাতায় আপনার পরিচিত পারিভাষিক শব্দগুলোর তালিকা তৈরি করুন।

পরিভাষা কেন প্রয়োজন

এক একটি পরিভাষার সঙ্গে বিশেষ ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্মৃতি ধারণা-বোধ মিশে থাকে। সে সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের উপলব্ধি ও চেতনা। নাইট্রোজেন চক্র, শীতনিদ্রা, অভিযোজন, ক্ষমতা, নিরক্ষীয় বায়ু, মরাকাটাল এ পারিভাষিক শব্দগুলো যেমন বিশেষ বিশেষ জ্ঞান জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত তেমনি প্রতিটি শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের অনুভূতি। ফলে রসায়ন (এটি একটি পারিভাষিক শব্দ) সম্পর্কিত আলোচনায় শীত নিদ্রা ও অভিযোজন ক্ষমতা, ভূগোল (এটি একটি পারিভাষিক শব্দ) সম্পর্কিত আলোচনার বেলাতেই নিরক্ষীয় বায়ু ও মরাকাটাল শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। ফলে ঐ পারিভাষিক শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত মানুষের মনে জড়িয়ে থাকে বিশেষ ধরনের অনুভূতি যার ফলে বিজ্ঞানের পরিভাষাগুলো বাণিজ্যের আলোচনায় কিংবা ভূগোলের পরিভাষাগুলো রসায়নের আলোচনায় অচল। যেহেতু পরিভাষাগুলোর সঙ্গে মানুষের উপলব্ধি ও চেতনা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে তাই বিশেষ জ্ঞানের আলোচনায় ঐ জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিভাষা অবশ্যই প্রয়োজন। যার সাহায্যে সহজেই বক্তব্যের মূল কথা পাঠকের বা শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করে দেয়া যায়। এজন্য রাজশেখর বসু বলেছেন, পরিভাষা মিশিয়ে ভাষাকে সংহত না করলে বিজ্ঞানী তার বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন না। মোট কথা পরিভাষা ছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা প্রায় অসম্ভব। পরিভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক-পাঠক বা বক্তা-শ্রোতার মধ্যে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ গড়ে তোলা সম্ভব। তাছাড়া পরিভাষা ব্যবহারের ফলে তত্ত্বমূলক রচনার প্রকাশভঙ্গি শক্তিশালী ও সংহত হয়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পরিভাষার সংজ্ঞা দিন।

২. পারিভাষিক শব্দ কিভাবে চেনা যায়?

৩. পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৪. বাংলা ব্যাকরণের সঙ্গে দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।

৫. ভূগোলের সঙ্গে সম্পর্কিত দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা পরিভাষা রচনার ইতিহাস জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত হবেন
- পরিভাষা তৈরির নিয়মাবলি লিখতে পারবেন।
- পরিভাষা তৈরির পদ্ধতির পরিচয় দিতে পারবেন।

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে যখন প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই সৃষ্টি হয় পরিভাষার। ঐ যে একটি কথা বলা হয় যে, প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী– একথাটি যেন পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরো বেশী সত্যি বলে মনে হয়। যে দেশ বা জাতি নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যত বেশী নিবেদিত তাদের জন্য পরিভাষার প্রয়োজন তত বেশী এবং তারা তৈরি করেন বা করতে বাধ্য হন নতুন সব শব্দ। বিগত দুশো বছরে দেশী ও বিদেশী প্রশাসক, সাহিত্যিক ও বিশেষজ্ঞদের সমবেত চেষ্টায় গড়ে উঠেছে বাংলা পরিভাষা এবং এখনো সে চেষ্টা শেষ হয়নি। এদেশে প্রথমে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয় মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বঙ্গপ্রদেশে। শাসনযন্ত্রকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থা এদেশে চালু করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে বৃটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। ইংরেজি ভাষায় রচিত বৃটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়েই অনুবাদকেরা অনুভব করেন পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা। এজন্য বলা যায়, আইন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা থেকেই বাংলা পরিভাষা চর্চার সূত্রপাত ঘটে। ১৭৮৪ সালে জনাথান ডানকান 'মপসল দেওয়ানী আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতে বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম' বাংলা ভাষায় ও বাংলা হরফে ছেপে প্রকাশ করেন। ডানকানের পর এডমন স্টোন, ফরস্টার, উইলিয়াম কেরী প্রমুখের অনুবাদের মাধ্যমে বৃটিশ ইংরেজি আইন বাংলায় রূপান্তর ঘটে। এই সকল বিদেশীদের প্রয়োজনের হাত ধরেই বাংলা ভাষায় আইনের আলোচনায় পরিচিত হয়ে ওঠে হাকিম, আদালত, ইজারা, জজ, গয়রহ, তহশীল, তহশীলদার প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ। ইংরেজ অনুবাদকদের হাতে সৃষ্ট ঐ সব পারিভাষিক শব্দ এখন বাংলা ভাষার প্রায় নিত্য পরিচিত শব্দে পরিণত হয়েছে।

এখন আমরা 'গভর্ণর বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ তাবৎ আইন'(১৭৯৩) নামে ফরস্টার কৃত একটি আইনের বাংলা অনুবাদ উপস্থিত করছি। এই আইনটির মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে এমন পারিভাষিক শব্দগুলো আপনারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন; তবে মনে রাখবেন এখানে যে গদ্যের সঙ্গে আপনারা পরিচিত হবেন তা প্রায় দুশো বছরের পুরনো বলে তা আপনাদের কাছে একটু খটোমটো, কোথাও বা গদ্য অশুদ্ধ বলে মনে হতে পারে– আপনার ও সব দেখার দরকার নেই। আপনি নমুনা লক্ষ করুন :

"হাকীমের উচিত জে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষত: সুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেন অতয়ের ঐ শ্রীযুত সকল মফস্বলী তালুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাষী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করণ উচিত

জানেন সেকালের তাহাই নির্দিষ্ট করেন কিন্তু এমন সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইবাতে কোন প্রকারে জমীদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যাধিকারীদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহারদিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না।"

কি খুঁজে বের করতে পেরেছেন এখানে কি কি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে? নিশ্চয়ই পেরেছেন। তবুও আমার সঙ্গে একটু মিলিয়ে নিন। এখানে যে সব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হল– হাকীম, মফস্বলী তালুকদার, প্রজা, জমিদার, হুজুরী তালুকদার, মোকররী জমা ও ওজর।

আইনের অনুবাদের মাধ্যমে পরিভাষা তৈরির যে সূচনা ঘটে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় তার পরবর্তী পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়। বাংলায় বিজ্ঞান পুস্তক রচনা ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরির প্রাথমিক কৃতিত্বের দাবীদার ফেলিকস্ কেরী। তিনি বাংলাতে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার খানিকটা বাংলা অনুবাদ করেছিলেন 'বিদ্যাহারাবলি' নাম দিয়ে। তাঁর অপর মূল্যবান গ্রন্থ 'ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা' প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সালে। ঐ বইতে তিনি যে সকল পরিভাষা তৈরি করেছিলেন সেগুলো এখনো আমরা ব্যবহার করছি। কয়েকটি উদাহরণ ঃ

Anatomy – ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা	Solid – ঘন
Muscle – মাংস পেশী	Surgery – অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা
Nerve – নাড়ী	Vein –শিরা।

ফেলিকস কেরীর পর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অন্য যাদের অবদান রয়েছে তাঁরা হচ্ছেন জন ম্যাক, পীটার বৃটন, পীয়ারসন প্রমুখ।

বাঙালিদের মধ্যে যিনি বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা তৈরিতে মনোযোগী হন তিনি অক্ষয় কুমার দত্ত। উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের তিনিই একমাত্র বিজ্ঞান মনস্ক সাহিত্যিক। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক যে চারটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেগুলো হচ্ছে : ১) ভূগোল (১৮৪১); ২। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (প্রথম ভাগ ১৮৫১, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয়ভাগ ১৮৫৯); পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬)। এসব বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তিনি তৈরি করেন বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ। তাঁর সৃষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের নমুনা এখানে দেওয়া হল ঃ

Magnet – চুম্বক	Compass – দিগ্‌দর্শন
Solid – কঠিন	Biology – প্রাণিবিদ্যা
Microscope –অনুবীক্ষণ যন্ত্র	Botany –উদ্ভিদ বিদ্যা
Telescope –দূরবীক্ষণ যন্ত্র	Southpole –কুমেরু
Astrology – জ্যোতিষ	North pole –সুমেরু

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর সৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অধিকাংশই পরবর্তীকালে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়েছে– আজো ব্যবহৃত হচ্ছে।

অক্ষয়কুমার দত্তের পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী দাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্ররায়, বি.এন.শীল, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গুণীব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন শব্দের বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়ে বাংলা পরিভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা।

শুধু ব্যক্তিগত ভাবেই নয় প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়েও বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই। পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা প্রথম শুরু করে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর যোগ্য নেতৃত্বে একদল কৃতবিদ্য বাঙালি সম্মিলিতভাবে পরিভাষা তৈরির যে চেষ্টা করেছিলেন তা দীর্ঘ ৪২ বৎসর যাবত (১৮৯৪-১৯৩৫) পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়েছিল। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের শেষ দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি গঠনে করে (১৯৩৪) বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করে খণ্ডে খণ্ডে তা প্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাজনের পর পশ্চিম বঙ্গ সরকার গঠন করে পরিভাষা

সংসদ (১৯৪৮)। সংসদ বিভিন্ন ধরনের পরিভাষা নির্মাণের আয়োজন করে। অন্যদিকে পূর্ববাংলার ভাষা কমিটি (১৯৪৮), বাংলা একাডেমী (১৯৫৭), কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (১৯৬৩), সরকারী শিক্ষা বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বাংলা পরিভাষা বহুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটিও (১৯৭৪) বাংলা পরিভাষা তৈরিতে বড় রকমের ভূমিকা রেখেছেন।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন পরিভাষা তৈরি একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ ঘটছে নতুন নতুন শব্দের আর আমরা পরিচিত হচ্ছি সে সব শব্দের সঙ্গে ফলে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে শব্দটির একটি বাংলা পরিভাষার। যখনই প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে তখনই হয়তো আমরা তৈরি করছি বা করতে বাধ্য হচ্ছিল নতুন একটি পরিভাষা। সঙ্গে সঙ্গে যোগ হচ্ছে আমাদের ভাষায় একটি নতুন শব্দ এবং সবার অজান্তেই ভাষা হয়ে উঠে সমৃদ্ধ।

মনে রাখবেন

বৃটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়েই বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের প্রথম উদ্যোক্তা হিসাবে জনাথান ডানকানের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। আইনের অনুবাদের পর বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে সৃষ্টি হয় বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরিতে প্রাথমিক কৃতিত্বের দাবীদার ফেলিকস্ কেরী। বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরিতে অক্ষয়কুমার দত্ত অগ্রগণ্য। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক চারটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ঐ চারটি বইতে তিনি যে সকল বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তা আমরা এখনও সাদরে গ্রহণ ও ব্যবহার করে থাকি। অক্ষয়কুমার দত্তের পর ব্যক্তিগতভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গুণীব্যক্তি বিভিন্ন প্রয়োজনে অসংখ্য পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিভাষা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন ও রাখছে সেগুলো হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী প্রভৃতি।

পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি

নিয়ম

যে কোন পারিভাষিক শব্দেরই থাকতে হয় চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য। সেগুলো হচ্ছে : সর্বজনস্বীকৃতি, স্বাভাবিকতা, বিশিষ্টার্থ প্রয়োগ, আড়ষ্টহীনতা। কিন্তু এই সব গুণ সম্পন্ন শব্দ তৈরি করতে হলে, যিনি পরিভাষা তৈরি করবেন, তাঁকে অবশ্যই মেনে নিতে হয় ভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো। তা ছাড়া ভাষাবিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কেও পরিভাষা সৃষ্টিকারীর থাকতে হয় পরিষ্কার ধারণা। এই ধারণার সাহায্যেই তিনি নির্বাচন করবেন এমন শব্দ যা সহজেই সমাজে গৃহীত হবে। দুরূহ ও দুরুচ্চার্য শব্দে পরিভাষা তৈরি হলে তা জনসাধারণের কাছে গৃহীত হয় না। তাছাড়া, আমরা আগেই বলেছি (পাঠ ১) যে শব্দটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে তার থাকবে সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ অর্থ এবং ারষ্ট তাৎপর্য। প্রত্যেকটি শব্দই একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে তাকে দ্বিতীয় কোন অর্থে প্রয়োগ করা যাবে না।

পদ্ধতি

যে কোন ভাষাতেই পরিভাষা তৈরি হয় সাধারণত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। পদ্ধতি তিনটি হল : ঋণ, ঋণ-অনুবাদ ও নির্মাণ। আসুন আমরা ঐ তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করি।

১। ঋণ

পৃথিবীর সকল ঋণেই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়; একমাত্র ভাষার ঋণে মানুষ ধনী ও সমৃদ্ধ হয়। যে ভাষায় যতো বেশী ঋণকৃত শব্দ আছে সেভাষা ততো সমৃদ্ধ। বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানে অন্য সকলের মত বাঙালিরও সমান অধিকার আছে। তাই যে ভাষা থেকে আমরা জ্ঞান আহরণ করবো তার শব্দ, ভাব, প্রেরণা আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। উগ্র স্বাদেশিকতা দ্বারা তাড়িত হয়ে হাইড্রো অক্সাইডকে 'অম্লজানমূলক উদ্বায়ীগ্যাস', টেলিফোনকে 'দূরালাপনী', বুনসেন বার্নারকে 'পিনাল-দাহক', ইনকেজশনকে 'সূচিকাভরণ' না লেখাই সঙ্গত। আজকাল আমরা

সবাই লোডশেডিং, চ্যারিটি বা ওয়ার্মআপ ম্যাচ, বাস, স্টেশন, অক্সিজেন এসব পারিভাষিক শব্দ অপরিবর্তীত ভাবেই গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ এসব শব্দ অমরা ঋণ করে বাংলা ভাষায় নিয়ে এসেছি এবং ঋণ শোধ না করলেও কেউ কখনো তাগাদা দিতে আসবে না; বরং বাংলা ভাষাকে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ করবে।

২। ঋণ-অনুবাদ

পুরনো, ভুলে যাওয়া কোন বাংলা শব্দকে তুলে এনে নতুন অর্থে ব্যবহার করেও পরিভাষা তৈরি করা যায়। শব্দের আগের অর্থটা জানা থাকলে বা বহাল থাকলেও ধীরে ধীরে নতুন অর্থটাই সবার কাছে পরিচিতি পেয়ে, নতুন অর্থ ধারণ করে ফেলে। ঋণ-অনুবাদ হতে পারে দু'ধরনের। সংস্কৃত বা দেশী এমন অনেক শব্দ পাওয়া যাবে যেগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ একটিই কিন্তু শব্দ অনেক। এ ধরনের শব্দগুলোর ভেতর থেকে একটি বেছে নিয়ে আমরা নতুন অর্থে প্রয়োগ করে গড়ে তুলতে পারি একটি পরিভাষা। 'বিজ্ঞান', ইতিহাস, পদার্থ প্রভৃতি শব্দ এমন ধরনের ঋণ অনুবাদের উদাহরণ। বিজ্ঞান শব্দটি বুঝাতো বিশেষ জ্ঞান- তা সে যে কোন জ্ঞানকেই বুঝাতো কিন্তু এখন পরিভাষা হিসাবে আমরা বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করছি।

৩। নির্মাণ

শব্দ নির্মাণের মত পরিভাষা নির্মাণের বেলাতেও ভাষার মূল প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার অর্থাৎ তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী থেকে উপাদান মিশিয়ে পারিভাষিক শব্দ তৈরি করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ হতে গৃহীত পরিভাষা যেমন 'দ্রাঘিমা', বিষুবরেখা', ল.সা.গু (লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণীতক), গ.সা.গু (গরিষ্ঠ সাধারণ গুণীতক) ইত্যাদি শব্দ পরিভাষা হিসাবে অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলা পরিভাষার রচনার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. বাংলা পরিভাষা তৈরির নিয়মগুলো লিখুন।
৩. পরিভাষা তৈরির পদ্ধতির পরিচয় দিন।
৪. আইন সম্পর্কিত দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।
৫. বিজ্ঞান বিষয়ক দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।
৬. আপনার জানা যে কোন দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নীচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পরিভাষা বলতে কি বোঝেন? জ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনায় পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা কি?
২. পরিভাষা কিভাবে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে?
৩. আপনি প্রায়ই ব্যবহার করেন এমন কিছু পারিভাষিক শব্দের একটি তালিকা তৈরির করুন।
৪. টীকা লিখুন

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, অক্ষয়কুমার দত্ত, ফেলিকস্ কেরী, বাংলা একাডেমী।

পরিশিষ্ট - ১

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থার বাংলা নাম

১.	President`s Secretariat অধিদপ্তর/পরিদপ্তর Bureau of Anti-corruption স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা Elcetion Commission Parliament Secretariat	১.	রাষ্ট্রপতির সচিবালয় দুর্নীতি দমন ব্যুরো নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ সচিবালয়
২.	Prime Minister`s Secretariat	২.	প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়
৩.	Ministry of Defence স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা Bangladesh Meteorological Department Inter-Service Public Relations Directorate	৩.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর আন্ত:বাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর।
৪.	Ministry of Communications স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা Bangladesh Road Transport Corporation	৪.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
৫.	Ministry of Post and Tele-Communication	৫.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
৬.	Ministry of Ports, Shipping and Inland Woter Transport	৬.	বন্দর, সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়
৭.	Ministry of Education স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা National Curriculum and Text Book Board.	৭.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৮.	Ministry of Agriculture	৮.	কৃষি মন্ত্রণালয়
৯.	Ministry of Fisheries and Livestock.	৯.	মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়
১০.	Ministry of Irrigation, Water Development and Flood Control.	১০.	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়
১১.	Ministry of Finance	১১.	অর্থ মন্ত্রণালয়
১২.	Ministry of Planning	১২.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১৩.	Ministry of Energy and Mineral Resources Bangladesh Power Development Board. Rulal Electrification Board.	১৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
১৪.	Ministry of Extablishment	১৪.	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
১৫.	Ministry of Foreign Affairs	১৫.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৬.	Ministry of Food	১৬.	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৭.	Ministry of Relief and Rehabilitation	১৭.	ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়
১৮.	Ministry of Health and Family Planning	১৮.	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১৯.	Ministry of Home Affairs	১৯.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০.	Ministry of Commerce	২০.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২১.	Ministry of Industries	২১.	শিল্প মন্ত্রণালয়
২২.	Ministry of Jute	২২.	পাট মন্ত্রণালয়

২৩.	Ministry of Textiles	২৩.	বস্ত্র মন্ত্রণালয়
২৪.	Ministry of Information	২৪.	তথ্য মন্ত্রণালয়
২৫.	Ministry of Labour and Manpower	২৫.	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
২৬.	Ministry of Law and Justice	২৬.	আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়
২৭.	Ministry of Works	২৭.	পূর্ত মন্ত্রণালয়
২৮.	Ministry of Local Government Rural Development and Co-operatives.	২৮.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
২৯.	Ministry of Social Welfare and Women`s Affairs	২৯.	সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩০.	Ministry of Youth and Sports	৩০.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৩১.	Ministry of Land	৩১.	ভূমি মন্ত্রণালয়
৩২.	Ministry of Religious Affairs.	৩২.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট-২

বহুল ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

A

Abandoned property	পরিত্যক্ত সম্পত্তি
Absconder	ফেরারী
Absorption	আীক্করণ
Account	হিসাব
Accounts Officer	হিসাব রক্ষণ অফিসার
Accused	আসামী
Acquired	হুকুমদখলকৃত/অধিগৃহীত
Ad hoc appointment	অড্হক নিয়োগ
Administration	প্রশাসন
Administrator	প্রশাসক
Adult Franchise	প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার
Advertisement	বিজ্ঞাপন
Advice	পরামর্শ/উপদেশ
Adviser	উপদেষ্টা
Agenda	আলোচ্যসূচী
Allocate	বরাদ্দ করা
Allocation	বরাদ্দ
Allotment	বরাদ্দ
Allowance	ভাতা
Annexure	সংযুক্তি
Annual Confidential Report(ACR)	বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট
Applicant	আবেদনকারী
Arrears	বকেয়া
Attestation	সত্যায়ন
Autonomous	স্বায়ত্তশাসিত

B

Baggage	মালপত্র
Bail	জামিন
Ballot	ভোট
Bank draft	ব্যাংক ড্রাফট
Bankrupt	দেউলিয়া
Basic Education	বুনিয়াদি শিক্ষা
Basic pay	মূল বেতন
Biased	পক্ষপাত দুষ্ট
Black list	কালো তালিকা
Body search	দেহতল্লাসী
Bond	মুচলেকা
Book-post	খোলা-ডাক
Budget allotment	বাজেট বরাদ্দ
Bureaucracy	আমলাতন্ত্র
By-election	উপ-নির্বাচন

C

Cabinet	মন্ত্রিপরিষদ
Calendar	বর্ষপঞ্জি
Cancel	বাতিল করা
Care of (C/O)	প্রযত্নে
Cash	নগদ
Cash-memo	ক্যাশ-মেমো
Casual leave	নৈমিত্তিক ছুটি
Certificate	প্রত্যয়ন/প্রমাণপত্র/সনদপত্র
Certified	প্রত্যয়িত
Chalan	চালান
Chief Guest	প্রধান অতিথি
Circular	পরিপত্র
Citizen	নাগরিক
Civil action	দেওয়ানী মামলা
Civilsuit	দেওয়ানী মামলা
Civil Court	দেওয়ানী আদালত
Client	মক্কেল
Compulsory	বাধ্যতামূলক
Complimentary Copy	সৌজন্য সংখ্যা
Compromise	আপস

D

Daily Balance	দৈনিক জের
Debit Balance	খরচের জের
Defence	প্রতিরক্ষা
Defendant	বিবাদী

Deputation	প্রেষণ
Discrepancy	গরমিল
Discrimination	বৈষম্যমূলক
Dispensary	ঔষধালয়
Dock worker	ডক শ্রমিক
Duty	শুল্ক
E	
Earnest money	জামানত
Eid advance	ঈদ অগ্রিম
Employment	কর্মসংস্থান/চাকুরি
Enclosure	সংলগ্নী
Enquiry	তদন্ত
Enquiry Commission	তদন্ত কমিশন
Excise	আবগারী
Excise duty	আবগারী শুল্ক
Export promotion	রপ্তানী উন্নয়ন
F	
Factories	কলকারখানা
Field worker	মাঠকর্মী
Final report	চূড়ান্ত প্রতিবেদন
Financial year	অর্থ বছর
Fire Service	দমকল বাহিনী
Firm	খামার/বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান
Foreign aid	বৈদেশিক সাহায্য
Freight	মাশুল
G	
Gist	সারমর্ম
Good conduct	শিষ্টাচার
Govt. Security	সরকারি ঋণপত্র
Grant	অনুদান/মঞ্জুরি
Growth	প্রবৃদ্ধি
H	
HandCoome Board	তাঁত বোর্ড
House Search	গৃহ তল্লাশি
House building advance	গৃহ নির্মাণ ঋণ
Housing and Settlement	গৃহ সংস্থা
I	
Immigration	বহির্গমন
Implementation	বাস্তবায়ন
In-charge	ভারপ্রাপ্ত
Incidental	আনুষঙ্গিক
Income tax	আয়কর

Inspector	পরিদর্শক
Inspector-General	মহা-পরিদর্শক
Investment	বিনিয়োগ
J	
Joint collaboration	যৌথ সহযোগিতা
Joint venture	যৌথ উদ্যোগ
Junior	কনিষ্ঠ
Jute goods	পাটজাত দ্রব্য
Jute mill	চটকল
L	
Labour court	শ্রম আদালত
Land Record	ভূমি রেকর্ড
Land revenue	জমির খাজনা/খাজনা
Land tax	জমির খাজনা/খাজনা
Liabilities	দায়-দায়িত্ব
Livestock	পশুপালন
Look after	দেখাশুনা করা
M	
Magistrate	হাকিম
Management	ব্যবস্থাপনা
Manpower employment	জনশক্তি কর্মসংস্থান
Marginal	প্রান্তিক
Manketing	বিপণন
Mass Communication	গণ যোগাযোগ
Mercantile Marine	নৌ-বাণিজ্য
Metropolitan Magistrate	মহানগর হাকিম
Metropolitan Police	মহানগর পুলিশ
Minimum Wage	নিম্নতম মজুরী
N	
Nationality Certificate	জাতীয়তাপত্র
News commentary	সংবাদভাষ্য
Notice	নোটিশ
Notification	প্রজ্ঞাপন
Nuclear	পারমাণবিক
O	
Office	দপ্তর
Official	দাপ্তরিক
On duty	কর্তব্যরত
Opening balance	ইজা
Ordinance	অধ্যাদেশ
Organization	সংগঠন
P	
Passport	পাসপোর্ট
Pay Fixation	বেতন নির্ধারণ

Pay increase	বেতন বৃদ্ধি
Permanent	স্থায়ী
Plaintiff	বাদী
Postage	ডাকমাশুল
Prescription	ব্যবস্থাপত্র
Printing	মুদ্রণ
Probation	শিক্ষানবিসী
Promotion	পদোন্নতি
Provisional	সাময়িক
Public Health	জনস্বাস্থ্য
Public holiday	সাধারণ ছুটি
R	
Recruitment	নবনিয়োগ
Regulation	প্রবিধান
Remark	মন্তব্য
Residence	বাসা
Residential	আবাসিক
Revenue	রাজস্ব
Rural Development	পল্লী উন্নয়ন
Rural Electrification	পল্লী বিদ্যুতায়ন
S	
Sale tax	বিক্রয় কর
Search warrant	তল্লাসী পরোয়ানা
Selection Committee	বাছাই কমিটি
Social Service	সমাজ সেবা
Standing Committee	স্থায়ী কমিটি
Steering Committee	পরিচালনা কমিটি
Summary	সার সংক্ষেপ
Supplement	ক্রোড়পত্র
Survey	জরিপ
T	
Tariff	অভিশুল্ক
Technology	প্রযুক্তি
Telegraph	তার
Town Development	শহর উন্নয়ন
Traffic jam	যানজট
Transport	যানবাহন/পরিবহণ
U	
Undertaking	অঙ্গীকার
Uniform	উর্দি
Urban Development	নগর উন্নয়ন
W	
Water Transport	নৌ পরিবহণ
Wealth	সম্পদ
Weather	আবহাওয়া